চতুর্থ অধ্যায়

আশালতা সিংহের প্রবন্ধ-নিবন্ধ

শ্রীমতী আশালতা সিংহ মূলত কথা সাহিত্যিক হলেও বিবিধ তত্ত্বকথা সম্পর্কে তিনি চিন্তাশীল প্রাবন্ধিকের মতোই যুক্তি তর্ক সহ আলোচনা করেছেন এবং পরিশেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলিতে তিনি নিজের মনের কথা বলতে চেয়েছেন এবং তত্ত্ব, তথ্য ও বস্তু উপাদানকে নিজের রস চেতনায় সিক্ত করে প্রবন্ধকে রসচেতনার কোঠায় তুলে ধরেছেন। আশালতা সিংহের লেখা প্রথম প্রবন্ধটির নাম 'নারী' যা ১৩৩৫ সালে বৈশাখ সংখ্যায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশ পায়। 'নারী' বিষয়ক প্রবন্ধগুলো ছাড়াও সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি-বিষয়ক আরও অগ্রন্থিত প্রায় সাতাশটি প্রবন্ধ তাঁর রয়েছে। তাঁর একমাত্র প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম 'সমী ও দীপ্তি'। গ্রন্থটি ১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী শিক্ষাক্ষেত্রের একনিষ্ঠ সত্যব্রত পুরোহিত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে আশালতা দেবী উৎসর্গ করেছিলেন। এই প্রবন্ধ গ্রন্থটি পড়ে শ্রীমতী রাধারাণী দেবী বলেছিলেন — যে ভাগলপুরের শ্রীমতী আশালতা দেবীর প্রবন্ধ পড়ে অনেক সমালোচকই সে প্রবন্ধগুলি পুরুষের লেখা বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কারণ নারীর লেখনী এমন সুন্দর হতে পারে অথবা নারীর মুক্তচিন্তা এত গভীর হতে পারে, এ তাঁরা ধারণাও করতে পারেন নি।

এই প্রবন্ধগ্রন্থটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধ গ্রন্থের আদলে রচিত সাতটি প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ। প্রবন্ধগুলি হল যথাক্রমে — 'বাস্তব ও কল্পনা', 'সাহিত্য পরিপূর্ণতা', 'সাহিত্যে রিয়ালিজম', 'সাহিত্যের আলোচনা', 'আলাপ ও আলোচনা', 'অন্ডাস হাক্সলি', 'আর্ট ও আমিত্ব'।

'বাস্তব ও কল্পনা' —

শ্রীমতী আশালতা সিংহের লেখা প্রবন্ধগ্রন্থ 'সমী ও দীপ্তি'র প্রথম প্রবন্ধটির নাম হল 'বাস্তব ও কল্পনা'। বাস্তব ও কল্পনা — সাহিত্যে এদের ভূমিকা নিয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিক লেখকরা এবং স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সম্বন্ধে কী ভেবেছিলেন তা প্রথমে একটু দেখা যেতে পারে। গ্রীক ভাষায় কবি শব্দের অর্থ হল নির্মাতা। কবি জীবনের অনুকরণ হল সৃষ্টি, যেখানে দার্শনিক প্লেটো অনুকরণ বলতে বুঝিয়েছেন নকল — লৌকিক জগতের বাস্তবের অবিকল প্রতিরূপ। অ্যারিস্টটল এই বিষয়টিকে পরবর্তীকালে স্পষ্ট করে জানালেন যে কবির কাজ অনুকরণ হলেও তা বস্তুগত নয় — সম্ভাব্য সত্যের অনুকরণ। শিল্পীকে হতে হয় রূপকার তাই শিল্পীর অপর নাম রূপদক্ষ।

অনুকরণ শব্দটিকে অ্যারিস্টটল গভীর তাৎপর্য বহন করে ব্যবহার করলেও পরবর্তীকালে বস্তুজ জগতের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতের প্রচলন দেখা গিয়েছে। ঘটমানের মধ্যে বিভিন্ন মতের প্রচলন দেখা গিয়েছে। ঘটমানের সঙ্গে সাহিত্যে দূরবর্তী সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে রোমান্টিক কবিরা মন ও কল্পনা শক্তির প্রাধান্য মেনে নিয়েছেন। এরপর ইতালীয় কবি সমালোচক হোরেসও স্পষ্টত কল্পনা শক্তির কথা বললেন না ঠিকই, কিন্তু কবিতা রচনার জন্য ভাবনার অবকাশের প্রয়োজনীয়তা ও বৈচিত্রের একীকরণের ক্ষমতার গুরুত্ব স্বীকার করে কল্পনা সম্পর্কে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরীজের আলোচনার ভূমিকা প্রস্তুত করে নিলেন। এরপর কান্ট কল্পনাকে ভাগ করলেন তিনভাগে। যথা —

(১) Reproductive বা লঘু কল্পনা, কবিগুরু যাকে বলেছেন কাল্পনিকতা।

(২) Productive - ইন্দ্রিয়বোধ থেকে জন্ম নেয় উপলব্ধি।

(৩) Aesthetic - যা থেকে আসে অতীন্দ্রয়তাবোধ ও সৌন্দর্যবোধ।

কল্পনার সাহায্যে শিল্পী গড়ে তোলেন যে শিল্পজগৎ সেই জগতের রূপ নির্মাণের প্রেরণা আসে শিল্পীর আত্ম প্রকাশের কামনা থেকে। সাহিত্যের জগতে কল্পনা শক্তির সহায়তায় অরূপকে রূপময় করেন, অন্যজন কল্পনার সহায়তায় সেই রূপময়কে আপন অন্তরের অরূপ রতনে পরিণত করেন।

তাই 'নীরব কবিত্ব' ও 'আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস' শব্দ দুটি রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যে বাজে কথা। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করার বাসনাকে যেমন শিল্প সৃষ্টির মৌলিক প্রেরণারূপে গণ্য করেছিলেন তেমনি শিল্প সাহিত্যের জগতে প্রকাশ করার কৌশলকেও দিয়েছিলেন যথেষ্ট গুরুত্ব। লোকেন পালিতকে লেখা একটি চিঠিতে কবিগুরু জানিয়েছিলেন যে, লেখকের নিজস্ব নয়, মনুষ্যত্ব বিকাশই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। কখনো নিজত্ব দ্বারা কখনো পরত্ব দ্বারা, লেখক শুধু উপলক্ষ, লক্ষ্য আসলে মানুষই।

'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে কবি বলেন — তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশ। তারপর যেহেতু সাহিত্য ও ললিত কলার কাজই হচ্ছে প্রকাশ, এইজন্য তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় করে আমাদের মনকে সত্যের স্বাদ দেওয়াই তার প্রধান কাজ। ঠিক এই কথারই যেন প্রতিধ্বনি শুনি আশালতা সিংহের 'বাস্তব ও কল্পনা' নামক প্রবন্ধটিতে যখন তিনি লেখেন —

> ''আমরা কখনো কখনো বুঝিতে পারি আমাদের বাহ্যিক জীবনের অন্তরালে কোন এক সৌন্দর্যের উৎস আছে। সকল সময় তা প্রকাশমান নয়। নানা দৈন্যে নানা অবান্তরতায় তাহার প্রকাশ প্রতিহত। কবির সৃষ্টি সেই দৈন্য ভেদ করিয়া ফুলের মত ফুটাইয়া তোলে আমাদের সংগুপ্ত সুষমা এবং

সামঞ্জস্যকে এ যদি না হইতো তবে কেবলই কল্পনা বিলাস লইয়া কবির কাব্য কখনই আমাদের প্রাণের গভীরে আসন পাইত না। ... এই মানুষের জীবনের হাটে নিমেষে নিমেষে কত রূপ পরিবর্তন হইতেছে। কবি জানে কেমন করিয়া রূপ বাছিয়া লইতে হয়। একটা মানুষের ছাড়াইয়া পড়া সহস্র বিভিন্ন এবং বিরুদ্ধ পরিচয় হইতে কবির মানস পটে ভাসিয়া ওঠে একটা সমগ্র সত্তা। সে সত্তা হইতে আমরা মানুষকে বৃহৎ এবং সুন্দর বলিয়া জানিতে পারি।''[১]

আশালতা সিংহের এই 'বাস্তব ও কল্পনা' প্রবন্ধটির শুরুতেই দেখি বর্ষণ ক্ষান্ত বিকেলের করুণ আলোয় বাড়ির বাইরের বারন্দায় বসা সমীরের ইচ্ছে জাগল দীপ্তির সঙ্গে বেশ করে তর্ক আলোচনা করতে। সময়টাকে আরও মনোময় করবার জন্য সমীরের দীপ্তির সঙ্গে খুনসুটি রসালাপের ইচ্ছা জাগে। লেখিকার উপস্থাপনা কৌশলটি ভারী চমৎকার। সমীরের এহেন ইচ্ছা দেখে দীপ্তি বলে 'তোমার ঐ বলিবার ভঙ্গী হইতে মনে হইতেছে আজ হয়তো তরকারীতে নুন দিয়াছি কিংবা যাইয়া দিব কথাটা আর মনে পড়িবে না।' এর উত্তরে সমীর বলে যে জীবনের বেশির ভাগ সময়ই আমরা পান থেকে চুন খসলে অস্থির হয়ে উঠি ঠিকই তবে এ প্রশ্ন মনে জাগে যে বাস্তবই বেশি সত্য নাকি ক্ষণিকের এই ভালোলাগা মুহূর্তগুলি বেশি আবেদন পূর্ণ? এর মীমাংসা হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে দীপ্তির মনে হয় দুটো দিকের কোনটাই মিথ্যে নয়। ক্ষণকালের জন্য উদ্ভাসিত মুহূর্তগুলি আসলে জীবনের আলো। তবে এরই স্থুল বাস্তব দিকটাও জীবন হতে বর্জনীয় নয়।

এরপর সমী ও দীপ্তি সাহিত্য সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা শুরু করে। কবির সৃষ্টি চরিত্র বাস্তব কিনা সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দীপ্তি বলে কবির কল্পজগতে তারা সত্য কারণ সাহিত্য জীবনের হুবহু নকল, জীবনে যা ঘটতে পারে তারই সম্ভাব্য রূপকে তুলে ধরাই প্রকৃত স্রষ্টার কাজ। তাই অমিত রায়, লাবণ্য, সুচরিতা এরা রবীন্দ্রনাথের জগতের সত্য ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে দীপ্তি আরও বলে যে আমাদের লৌকিক জীবনের আড়ালে কোন এক সৌন্দর্যের উৎস রয়েছে যা সব সময় দেখা যায় না। আপাত তুচ্ছতার ভিড়ে সে সৌন্দর্য সর্বদা প্রতিহত হচ্ছে। কিন্তু কবি সেই তুচ্ছতার পর্দাভেদ করেও ঐ সৌন্দর্যের সন্ধান পান এবং তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে তাকে রূপ দিয়ে পাঠকের পাঠযোগ্য করে তোলেন।

'সাহিত্য পরিপূর্ণতা' —

'সমি ও দীপ্তি' প্রবন্ধ গ্রন্থটির দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'সাহিত্য পরিপূর্ণতা'। প্রবন্ধটিতে সাহিত্যে শ্লীলতা এবং অশ্লীলতা প্রসঙ্গে দীপ্তি এবং সমীর কথা বলছিলেন। আজকালকার লেখকেরা যে বড় বেশি অশ্লীলতা আমদানি করছে তাদের লেখায় — এ অভিযোগ যখন লোকে তোলে তখন সমীরের বক্তব্য হল পূর্বে

কালীদাস, সেক্সপীয়র প্রভৃতি মহান লেখকদের লেখাতেও অশ্লীলতা ছিল কিন্তু তবুও পাঠকবর্গ সেইসব কবিদের কাব্য পাঠে যথেষ্ট পরিতৃপ্তি পেত। এর উ ত্তরে সমী বলেন যে আসলে সেকালে কবির কাব্যের প্রয়োজনেই, শকুন্তলা - দুষ্মন্তের মিলনকে খাঁটি দেখাতেই যা কিছু অশ্লীলতার আমদানি করেছিলেন, শুধু অশ্লীলতা দেখানোর জন্যই অশ্লীল লেখা লেখেননি। আসলে কবি অন্তরের কোন আদর্শকে কাব্যের সমগ্র ধারার সাথে মিশিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন সেই কথাটাই শ্রদ্ধার সাথে স্তব্ধভাবে পাঠক কুল অনুভব করছে বিষয়টিতে যেটুকু অশ্লীলতা রয়েছে তা তাদের বিচলিত করবে না। এ প্রসঙ্গে দীপ্তি আর বলে যে, 'সকল কবির কাব্যের গূঢ় অভ্যন্তরে এই পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে। সকল বড় কাব্যই আমাদিগকে বৃহতের মধ্যে আহ্বান করিয়া ছেদ করিয়া বাহির করে, পরে একটি ভূমার সহিত বাঁধিয়া দেয়। যে লেখায় শুধু অশ্লীলতার বাড়াবাড়ি কিন্তু কোন শান্তিপূর্ণ সুন্দরে তা পরিসমাপ্ত হচ্ছে না শুধু উত্তেজনার চিকিৎসার তেমন সৃষ্টি কখনোই পাঠকের মনে স্থায়ী আসন পায় না। আর তাই — ''কোন কবির কাব্য পড়বার সময় আমরা দুটো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। সেই প্রশ্ন দুটি হল — (১) কবির পূর্বমেঘ আমাদের কোথায় বের করে আর উত্তর মেঘ কোন্ সিংহ দ্বারের সামনে এনে দাঁড় করায়।''[২] শুধুই প্রেম সংক্রান্ত বিষয় নয় যে কোন বিষয়েই যথাযথ মাত্রা রাখতে না পারলেই তা অশ্লীল হয়ে ওঠে। এ কারণেই যথার্থ শ্রদ্ধার সঙ্গে অন্তদৃষ্টি এবং আবেগ নিয়ে দুঃখ-দৈন্য দারিদ্র্যের কথা যেখানে লেখা হয়েছে সেখানে তা সাহিত্যিক ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়েছে। আর যেখানে লেখক তা না করে কেবল উৎকণ্ঠা আস্ফালনের দ্বারা দাপাদাপি করেছেন সেখানেই রসভেদ হয়েছে।

সাহিত্যের বিচার করতে হলে তাই দরদ দিয়ে হৃদয় দিয়ে সমগ্রভাবে বোঝার চেষ্টা করা প্রয়োজন তা না হলে রসাস্বাদন সম্ভবপর হবে না। ১৩৩৬ এর কার্তিকের 'সাহিত্য বিচার' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন — আজকাল সাইকো-অ্যানালিসিসের বুলি অনেকের মনকে পেয়ে বসেছে। সৃষ্টিতে অবিশ্লেষ্য সমগ্রতার গৌরব খর্ব করার মনোভাব জেগে উঠেছে। মানুষের চিত্তের উপকরণে নানা প্রকার প্রবৃত্তি আছে — কাম, ক্রোধ, অহংকার ইত্যাদি ছিন্ন করে দেখলে যে বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়, সম্মিলিত আকারে তা পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত হল সাহিত্যের সমগ্রকে সমগ্র দৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে। । সাহিত্য নামক সমগ্র একটি কর্মকে টুকরো করে বিচার করেন যাঁরা, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের মতে 'ব্যবসাদার বিচারক'।

'সাহিত্যে রিয়ালিজম' —

আশালতা সিংহের লেখা 'সমী ও দীপ্তি' গ্রন্থের তৃতীয় প্রবন্ধটির নাম 'সাহিত্যে রিয়ালিজম'। প্রবন্ধটি আলোচনার পূর্বে দেখা যাক বিয়ালিজম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সাহিত্যকরা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী বলেছিলেন।

শিলার এবং শ্লোগেল — এই দুই দার্শনিক অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে শিল্প সাহিত্যে external reality অর্থে realism শব্দটি আমদানি করেছিলেন। হোমর, শেকস্‌পীয়র, রাবেলা, সাভানতেজ এরপর উনিশ শতকে স্তাদাল-বালজাক-ফ্লোব্যায়াব, পুশকিন, তলস্তয়, চেকভ, শার্লোট-ব্রান্টি-ডিকেন্স হেনরি জেম্‌স ও এই বাস্তব জগতের উপাদান এবং সমস্যা তাদের গল্প-উপন্যাস-নাটকে ব্যবহার করেছেন। এখন সাহিত্যে বাস্তবতা বলতে যদি বস্তু জগৎ থেকে আহৃত উপাদানের যথাযথ ব্যবহার বুঝি তাহলে সেই বাস্তবতা যেমন হোমারের ছিল না তেমনি হেনরি জেমস-এরও নেই।

রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের গোড়ার দিকে সাহিত্যে কোন রকম বাস্তবতার অনুপ্রবেশকে তিনি সহ্য করতে না পারলেও পরবর্তীকালে শুধু আপত্তি তুলে ছিলেন বাস্তবতার নামে জঘন্যতার আমদানির বিরুদ্ধে। 'লোকহিত' প্রবন্ধে কবিগুরু সাহিত্যকে সামাজিক দায়ভার থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে দায়িত্বহীন বললেও তাঁর নিজের সাহিত্য সামাজিক গুরু দায়িত্ব পালনে সক্ষম।

শ্রীমতী আশালতা সিংহের লেখা 'সমী ও দীপ্তি' গ্রন্থের তৃতীয় প্রবন্ধ 'সাহিত্যে রিয়ালিজম'-এ দেখি দীপ্তি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আবৃত্তি করার পর সমীকে বলে যে সাহিত্যে রিয়ালিজম (বাস্তবতার) যে ক্ষুধা চতুর্দিকে উঠেছে তার কোন দিশা যখন কোথাও পাচ্ছি না তখন এই ধরনের কবিতার মধ্যে যেন সংসারের নিবিড় আনন্দ এবং বেদনাকে অনির্বচনীয় রূপে ধরা দিয়েছে। কবিতাটির কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি —

"... সংসারের মাঝে দুয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দুয়েকটি কাঁটা করি দিব দূর
তারপরে ছুটি নিব! ..."[৩]

সমী বলে যে আজকালকার রিয়ালিস্টিক লেখকেরা বলেছেন যে তাঁরা ভাব বিলাসে এবং কল্পনার মায়াজালে সত্যকে অস্পষ্ট করে দেখাবে না। সংসারে যা ঘটে থাকে যা একেবারেই সাধারণ, সহজ, স্বাভাবিকতাকেই তাঁরা প্রকাশ করবেন। এমন একদিন ছিল যখন মহাকাব্য রচনা করার জন্য রামের মত আদর্শ চরিত্র মহাকবিদের খুঁজতে হয়েছে।

আজকালকার সাহিত্যিকেরা সাহিত্যে রসের চেয়ে সত্যের দিকে বেশি ঝুঁকেছেন। অর্থাৎ কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্‌-এর পরিবর্তে কাব্যং সত্যাত্মকম বাক্যম্‌ কথাটাই যেন তাঁরা ব্যবহার করেছেন। এটা ঠিক যে, সৃষ্টি পেছনে সত্য অভিজ্ঞতা এবং সত্যকার অনুভূতি থাকা চাই। সাহিত্যিকদের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে। সেই দৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি যেটুকু ছেঁকে নেবেন তা অবিমিশ্র fact নয়। এ প্রসঙ্গে লেখক

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন যে তাঁর সৃষ্টি চরিত্রগুলি সত্য ঘটনা থেকে সংগ্রহ করা কিনা? উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে তৈরী। অর্থাৎ সত্যকে শুধু প্রকাশ করা নয় তাকে প্রস্ফুটিত করে তোলার জন্যই তারা যে দেখেন তাঁর সাথে আরও কিছু যোগ-বিয়োগ করতে হয়। কবি-সাহিত্যিক সত্যকে এবং সম্ভাব্য সত্যকে অর্থাৎ যা ঘটতে পারে এমন বস্তুকেই লেখায় ফুটিয়ে তোলেন। কবিগুরুও তাঁর 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধ গ্রন্থে যেমন বলেছেন —

> ''কেবল পাঠকের এজলাসে লেখকের একটা ধর্ম শপথ আছে যে, সত্য বলিব।
> কিন্তু সে সত্য বানাইয়া বলিব।''[৪]

ভালোর উপর অত্যন্ত লোভ জাগিয়ে দেওয়া, সৌন্দর্য সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল করা সকল কালের সকল কবি, শিল্পী এবং সাহিত্যিকের সবচেয়ে বড় কাজ।

সাহিত্যের মাঝে পাঠক কেবল মাত্র কোন বস্তুর বর্ণনা পায় না, পায় ব্যঞ্জনা। সমীর মতে সত্যিকার রিয়ালিস্টিক লেখক হওয়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ সংসারে যা স্বভাবতই সুন্দর, যা মহান তাকে চিত্রিত করে হৃদয় মনকে মজানো সহজ কিন্তু অবজ্ঞাত কোণ থেকে সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করা এবং অখ্যাত, অনাদৃত প্রাত্যহিক জীবনের জঞ্জাল মুক্ত করে তাদের সাহিত্যে উপস্থাপন করা কঠিন। শক্তিমান না, হয়ে শক্ত জিনিসে হাত দিলেই গোলমাল বাধে। তাই রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী', 'চিত্রাঙ্গদা'য় দেহের প্রসঙ্গ থাকলেও তা অশ্লীল হয় না। একই কথা মহান কবিদ্বয় কালিদাস এবং শেক্সপীয়র প্রসঙ্গে প্রযোজ্য। বস্তুত তপস্যা নেই, স্পর্ধা আছে শুধু এতে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। আর সেজন্যই 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে কণ্ব আশ্রমে কবিবর কালিদাস যার অবতারণা করেছিলেন তার পিছনে সত্যের জোর না থাকলে সে বস্তুকে স্থূলতা এবং ভাল্‌গারিটির হাত থেকে কেউই রক্ষা করতে পারতেন না। সেখানে দেহ সম্ভোগের যত কিছু বর্ণনা ম্লান হয়ে কুসুমের মত ঝরে গেছে, তা বিদীর্ণ করে যা ফুটে উঠেছে তা প্রশান্ত, আভাময়, চিরদিনের চিরকালের সৌন্দর্য রূপ!

'সাহিত্য আলোচনা'—

'সমী ও দীপ্তি' গ্রন্থের চতুর্থ প্রবন্ধ 'সাহিত্য আলোচনা'। সাহিত্য আলোচনা বিষয়ক প্রবন্ধে সমী প্রথমেই সে প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন তা হল আজকাল সাহিত্যের চেয়ে সাহিত্য কী, সাহিত্যের রীতিনীতিই বা কী প্রকার সেই সম্বন্ধে লোকের বেশী কৌতূহল রয়েছে। এরই সঙ্গে সমী আক্ষেপ করে যে বাংলা সাহিত্যে প্রসার নেই অর্থাৎ বৈচিত্র্য নেই। কল্পনার সঙ্গে জীবনের সত্যকার অভিজ্ঞতা এসে না মিললে দেহে যেমন প্রাণ সঞ্চার হয় না ঠিক তেমনি সাহিত্যে জনজাতির নিজস্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে সেটা প্রকৃত সাহিত্য হয় না। আসল সাহিত্য জাতির ট্রাডিশনের উপর নির্ভর করে। 'যে জাতির ট্রাডিশন নাই সে জাতির সাহিত্যও নাই।

আশালতার মতে, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক যে কোন অতি প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়েও সাহিত্য হয় না। বাংলাদেশের যা জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রেম, স্নিগ্ধতা, আবেগ-প্রবণতা-এসব দিয়েই বাংলা সাহিত্যের রূপ ফুটে উঠেছে। তাই তো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' উপন্যাসের বিপ্লপবাদের কাহিনী, সব্যসাচীর শক্তিমত্তার কথা ছাপিয়ে যা বড় হয়ে দেখা দেয় তা হল অপূর্ব আর ভারতীর সুমধুর স্নেহরস সমৃদ্ধ প্রেমের আখ্যান। তাদের দুজনের প্রেম সম্পর্কের মাধুর্য সমস্ত মনকে মুগ্ধ, অভিভূত আবিষ্ট করে রাখে।

পাশ্চাত্য সাহিত্য জগতেও এই একই ধরনের কথা যেন শুনতে পাই যখন দেখি প্লেটোর Symposium এর ভাষ্যকার ফিসিনা-র মতে 'প্রেম থেকে শিল্পের জন্ম' এবং 'প্রেম'ই শিল্পের প্রধান বিষয়। কান্ট-হেগেল-শিলার- শোপেন হাওয়ার-হার্বার্ট স্পেন্সর প্রমুখের মাধ্যমে এই ভাববাদী সাহিত্য দর্শন আরও বৈচিত্র ও গুরুত্ব লাভ করে পরবর্তীকালে। এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শুনি আশালতার সিংহের লেখাতেও সাহিত্য স্রষ্ট্রার শক্তিতে, সৌন্দর্য, গরিমায়, মাধুর্যে এই জগৎ থেকে উদ্ভুত হয়েও একটা স্বতন্ত্র জগতের সৃষ্টি করেছি। একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শুনি আশালতা সিংহের লেখাতেও — সাহিত্য তার স্রষ্টার শক্তিতে, সৌন্দর্যে, গরিমায়, মাধুর্যে এই জগৎ থেকে উদ্ভূত হয়েও একটা স্বতন্ত্র জগতের সৃষ্টি করেছে।

উপরন্তু বড় বড় প্রতিভা সম্পন্ন লেখকদের লেখার কোনখানটায় আইডিয়ালিজমের মাত্রা চড়েছে তার বিচার করা মোটেই সহজ নয়। একটি মানুষকে সম্পূর্ণ বুঝতে হলে ঈশ্বরের মত অসীম স্নেহ কার আছে যে সমালোচনা সঠিকভাবে করতে পারবে। এ ধরনের বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ সহ আশালতারও।

'আলাপ-আলোচনা' —

সমী ও দীপ্তি গ্রন্থের পঞ্চম প্রবন্ধের নাম 'আলাপ-আলোচনা'। প্রবন্ধটির শুরুতেই দেখি শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে এক মনোরম পরিবেশে দীপ্তি বাণভট্টের 'কাদম্বরী' কাব্য পড়ার তোড়জোড় শুরু করেছেন। সমী বলেন যে 'কাদম্বরী'তে রাজকুমার চন্দ্রপীড়ের সঙ্গে বন্দিনী পত্রলেখার যে সম্বন্ধটুকু গড়ে উঠেছে সত্যি সত্যি স্ত্রী লোকের সঙ্গে পুরুষের ঠিক এরকম কোন বন্ধুত্ব হয় কিনা তা তার জানতে কৌতূহল হয়। সমী আরও বলেন যে, আধুনিক ইউরোপে স্ত্রী এবং পুরুষের মাঝে companionship বলে যে একটা অভিন্ন এবং ব্যাপক সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়েছে তার ভিতরকার অগ্ন্যুৎপাতের আশঙ্কা দেখে আমাদের শাস্ত্রে এই জাতীয় সম্বন্ধকে উৎপাতের দ্রব্য বিবেচনা করে এই সম্বন্ধ যাতে গঠিতই না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

সভ্যতার উন্মেষকালে যখন জীবন সৃষ্টির প্রয়োজনই ছিল ব্যাপক, যখন মানসিক চর্চার খুব একটা প্রসার ছিল না তখন স্ত্রীলোকের ভূমিকা ছিল জীব সৃষ্টিতে এবং অন্যান্য কাজে ভূমিকা ছিল

পুরুষের। ধীরে ধীরে সভ্যতার চূড়া যখন দিগন্ত প্রসারিত হল তখন পুরুষরাই মানসলোকের সৃষ্ট জাতির মনোবৃত্তির প্রসার ক্রমে বেড়ে উঠলে সে তখন পৃথিবীর নব নব সমস্যাকে আপন জীবন রসে জীর্ণ করবে এবং সমস্ত জাতির যদি তা ট্রাডিশন হয়ে উঠে তাহলেই বাংলা সাহিত্যের প্রসার বাড়বে। শুধু সাহিত্য নয় শ্রেষ্ঠ লেখকের সাহিত্য প্রতিভার কথা বলতে গিয়ে সমী বলেন যে, জীবন থেকে সাহিত্য সৃষ্টি হলেও সেই জীবনের কোন্‌স্থানে কতটুকু প্রকাশ করতে হবে যা এলোমেলো ছন্নছাড়া হয়ে আছে যার মধ্যে অসংখ্য পুনরাবৃত্তি তাকেই ঠিক কেমন করে গুছিয়ে কোন্‌দিক থেকে দেখাতে পারলে মানুষের হৃদয়ে তা স্পর্শ করবে সেটুকু বেছে নেওয়াই শ্রেষ্ঠ প্রতিভার বড় ক্ষমতা।

কবি সাহিত্যিকের কাছে দাবি হল বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন, খন্ডিত জীবন ও প্রকৃতিকে সংহত করে তাকে এমন করে প্রকাশ করতে হবে যাতে তা দেখা মাত্র লোকের চোখে লাগে, মনে ধরে, অন্তঃকরণে তা গাঁথা হয়ে যায়। স্টাইল বড় না প্লট বড় এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দেখা যায় যে, কোনটাই তুচ্ছ নয়।

কাব্যরূপ যা গড়ে ওঠে তাতে বিষয়, ভাব, রীতি সবকিছু মিলে তার স্রষ্টার আবেগ বা ইমোশনই সব নয়, বুদ্ধি বা ইনটেলেক্টও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ সাহিত্য যে আবেগের উচ্ছ্বসিত মূর্তি মাত্র নয়, এক ধরনের সচেতন সৃষ্টি তার প্রমাণ আছে রূপে। পাঠকের প্রবেশ ঘটে রূপের সিংহ দরজা দিয়ে। সাহিত্যের রূপই লেখকের প্রধান সহায় এবং শেষ সম্বলও। আবার বিষয়বস্তুতে পাঠকের অনুপ্রবেশ ঘটে এই রূপের মাধ্যমেই। পৃথক পৃথক ভাবে বিষয় ও রূপের বোধ জাগে না পাঠকের মধ্যে। টলস্টয় তথাকথিত সুন্দর রূপের স্রষ্টা সাহিত্যিকদের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন রূপসৃষ্টির দিকে তাঁদের অধিক মনোযেগের জন্য। রূপের গৌরব স্বীকার করতেন বলে রবীন্দ্রনাথও সাহিত্যের রূপান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন না। যা জ্ঞানের জিনিস তা এক ভাষা আরেক ভাষায় স্থানান্তর হয়। কিন্তু ভাবের বিষয় সম্বন্ধে একথা খাটে না। তা নির্দিষ্ট মূর্তিকে আশ্রয় করে থাকে। তবে এও ঠিক যে মনোজগতের সৃষ্টিতে সরাসরি না হলেও নারীর প্রভাব একেবারে অস্বীকার করা মোটেই যায় না। নারী তার মাধুর্য, লাবণ্য দ্বারা সৃষ্টি শীলতাকে দ্রুততর করে। নারীলাবণ্য যেন অনুঘটকের কাজ করে। তবে এই নারীলাবণ্যকে পুরোপুরি বাদ দিয়েও পুরুষ তার সাধনা ও সৃষ্টিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পেরেছে। তারও কিছু উদাহরণ রয়েছে। যেমন — মিলটন, নীট্‌শে, সোপেন-হাওয়ার— এদের মতো বড় বড় সৃষ্টিকারের জীবনেই এর দৃষ্টান্ত রয়েছে।

তব এতো বাহ্যিক ব্যাপার। মনোজগতের আরেকটা রহস্যময় দিকও রয়েছে যেখানে প্রমাণের চেয়ে অনুভবের দিকটাই বড়। আর পুরুষের তুলনায় নারীর চরিত্র-বৈচিত্র্য অনেক বেশি। জীবনের কোন দিককে একান্তভাবে বিকশিত করতে গিয়ে অপর দিকে শূন্যতা তাকে ভীষণভাবে পীড়া দেয়।

স্ত্রী এবং পুরুষ প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্বে দেহ এবং মনের সূক্ষ্ম শত সহস্র রহস্যময় সমাবেশ ঘটে,

কোনটাকেই ঠিক উপেক্ষা করা চলে না। তবে দেশের আকর্ষণকে কৃত্রিম উপায়ে এবং ভঙ্গিমা আশ্রয় করে অহরহ চোখে পড়াতে চাইলে সমগ্রের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায় — এটাই আশালতার মত। পুরুষের চিত্তলোকে স্ত্রীলোক যে মাধুর্যের ছায়া সঞ্চার করে সেটা তাদের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। মেয়েদের এই প্রভাব এবং আকর্ষণকে সহজ করে রাখতে পারলেই ভালো তবে এও ঠিক যে, যে সমাজ প্রেমকে যত বিশ্বাস করে অধিকার দিয়েছে সেই সমাজেই পুরুষের প্রতিভা সেই অনুপাতে সর্বব্যপী হয়েছে। এই দিকে আধুনিক ইউরোপকে আমরা যতই অবিশ্বাস করি এবং শক্ত কথা বলি, এই কি প্রমাণ হয়েছে যে তাদের দেশে স্ত্রীলোকের মাধুর্যের এবং প্রেমের শক্তিকে বিস্তৃত পরিসর দিয়ে তারা জ্ঞানে, কর্মে, বীর্যে সমস্ত ক্ষেত্রে ক্রমাগত বড় হয়ে চলেছে এবং ভারতবর্ষ প্রাচীন সতর্ক বিধিকে যতই আঁট করে বাঁধতে যাচ্ছে, তা দীনতা, তার জীর্ণতা ততই শতধা হয়ে ফুটে উঠছে।

'অল্ডাস্ হাক্স্লি' —

শ্রীমতী আশালতা সিংহের 'সমী ও দীপ্তি' প্রবন্ধগ্রন্থের ষষ্ঠ প্রবন্ধ 'অল্ডাস্ হাক্স্লি'। অল্ডাসের লেখা কেন বারে বারে পড়তে ভালো লাগে সে কথা ব্যক্ত করতেই এই প্রবন্ধটি লিখেছেন আশালতা। প্রবন্ধটিতে 'আলসী' নামক একটি কবিতার সপ্রশংস উল্লেখ পাচ্ছি। আলস্য-এর মতো একটি তুচ্ছ বিষয়ের ওপর লেখা কবিতাও যে কত মনোগ্রাহী হতে পারে তারই কথা বলতে গিয়ে ইংরেজ কবি অল্ডাস হাক্সালির প্রসঙ্গ এনেছেন।

হাক্স্লির 'On the Margin' বই এর 'Accidie' প্রবন্ধটি পড়লেই আলসী কবিতা প'ড়ে এত লোকের মুগ্ধ হবার কারণ সহজেই বোঝা যাবে। আশালতার মতে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের পর এত সরল করে, এত সুন্দর করে অথচ এত যুক্তির সাথে প্রবন্ধ রচনা অল্ডাস হাক্সলি ছাড়া খুব কম লোককেই তিনি লিখতে দেখেছেন।

হৃদয়বেগের আতিশয্য, সস্তা আইডিয়ালিজমের প্রাচুর্য উচিত-অনুচিতের প্রখর বিবেকবোধ এ সকল সংস্কারকে দূরে সরিয়ে রেখে পরিস্কার, স্বচ্ছ টলটলে বুদ্ধির সাথে যাচাই করে নেওয়ার যে জগৎ সেটাই যে একমাত্র সত্য সেটা অনেকে লিখলেও হাক্স্লির মত জোরের সঙ্গে বলতে পারে না। লেখিকার মতে তাদের এই সময়কালটা স্বপ্নভঙ্গের কাল এর আগের যুগে মানুষের মধ্যে নৈরাশ্য, হতাশা ছিল কিন্তু এত ব্যাপক হারে, বিস্তৃত আকারে তা ছিল না। তাই এত বড় শূন্যতার বোঝা, এত দারুণ নিরাশার ধাক্কা সামলাতে হলে ক্লান্তি এবং আলস্যের ভাব আসাটা অনিবার্য।

ইংরেজ লেখক অল্ডাসের বুদ্ধির ভারের চেয়ে ধার বেশি। সত্যকে প্রকাশ করে দেখবার, সেন্টিমেন্টাল ঈষৎ হাসি হাসি ভাবে, বড় বড় কথাকেও সে চমৎকারভাবে দু এক কথায় মীমাংসা করে দেন। রচনারীতি নাকি বিষয় — কোন্টা বড় এ প্রসঙ্গে হাক্স্লির মত হল, বাণী দিতে পারলে পৃথিবীর

মত পুরাতন বস্তুতেও নবজীবনের রস সঞ্চার করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন যেমন— 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায় অভিশাপ', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' — এ সকল বিষয়বস্তুর সংবাদ কবির লেখার আগে থেকেই পাঠককুলের জানা ছিল। লেখিকা আশালতার অল্ডাসকে ভালোলাগার আরও একটি বিশেষ কারণ হল অল্ডাস কোন সত্যকেই চরম বলে মানতে চান না। সকল দেশের প্রথা, সংস্কার, আদর্শবোধকে যে শুভবুদ্ধি মিলিয়ে নিয়ে নিজের অন্তরের প্রেরণায় তাদের ভেতর থেকে সত্যকে গড়ে তুলতে পারে সেই আসল পথিক। অল্ডাস সমস্ত পৃথিবীর পথিক আর তাই অনেক সময় অল্ডাসের লেখা উপন্যাসের চাইতে তার ভ্রমণের বইগুলি পড়তে যেন বেশি ভালো লাগে।

শ্রীমতী আশালতা সিংহের প্রবন্ধ গ্রন্থটির সপ্তম প্রবন্ধ 'আর্ট ও আমিত্ব'। আধুনিক একটি বাংলা উপন্যাসের ভূমিকা পড়ে দীপ্তির মনে হয়েছে আর্টের সঙ্গে আমিত্বকে এক করে ফেলেছে বর্তমান কালের বাংলা সাহিত্য। আর তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সৃষ্টিশীল এমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না যেখানে হৃদয় গভীরভাবে আশ্রয় পেতে পারে যদিও বাংলা সাহিত্যের ভাষা-ভঙ্গিমার দিন দিন উন্নতি ঘটছে কিন্তু কোন গভীর ভাবকে সে তৈরী করতে অক্ষম।

শুধু আর্টের ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের ক্ষেত্রে, প্রেমের ক্ষেত্রে সর্বত্রই এই আমি নামক পদার্থটিকে নিয়েই যত গোলমাল বাঁধে। প্রেমাস্পদের সঙ্গে নিজের আমিত্বকে জড়িয়ে মেলানোর ফলেই স্বপ্নভঙ্গ ঘটে কারণ এতদিন নিজেকে নিয়ে যেই প্রেমাস্পদের আসল স্বরূপ আগাগোড়া ঢাকা ছিল।

প্রাবন্ধিক আশালতার মনে হয়েছে আজকাল ইনটেলকচুয়্যাল উপন্যাস বলে যে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে তা একেবারে অর্থহীন। যেসব স্বনামধন্য লেখক বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন লাভ ক'রে সকল দেশের মনোহরণ করেছেন যেমন — কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — এঁদের লেখা সাহিত্যের প্রধান গুণ হল — সে লেখায় তাঁরা কোনখানে তাঁদের সৃষ্টিকে ঠেলে রেখে নিজেকে জাহির করেননি। অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ ভঙ্গীতে শক্তিশালী সাহিত্যিক জীবনকে আঁকেন। কারণ জীবন দিয়েই জীবনকে স্পর্শ করা যায়, ভাঙাভাঙীর কারুকুরি দিয়ে নয়, একথাও ঠিক যে, সমস্ত দেশের চিত্তশক্তি এবং প্রাণশক্তির মধ্যে একটা নিগূঢ় সংযোগ, একটা নিভৃত মিলন থাকলে তবেই সৃষ্টির শতদল একান্ত স্বাভাবিকভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারে। কিন্তু আজকাল আমাদের দেশে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত এবং স্বাধীন চিন্তায় সক্ষম লোকের সাথে সাধারণ মানুষের প্রভেদটা এত বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কোনখানে কারও সাথে কারও এতটুকু যোগ নেই।

আর এজন্যই অনেক ভালো লেখকের লেখাও সাধারণ লোকের সামগ্রী হয়ে উঠছে না, ফলে লেখকেরাও নিজেরা নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন হয়ে অভিমান করছেন, ক্ষোভ প্রকাশ করছেন, শান্তি পাচ্ছেন না।

আশালতার এই ভাবনার মধ্যেও আমরা রবীন্দ্র প্রভাবই দেখি। কারণ রবীন্দ্রনথও তাঁর 'সাহিত্য'

গ্রন্থের ‘সাহিত্যের সামগ্রী’ প্রবন্ধে একদা লিখেছিলেন —

> ‘‘সাধারণের জিনিসকে বিশেষভাবে নিজের করিয়া, সেই উপায়েই তাহাকে পুনশ্চ বিশেষভাবে সাধারণের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।’’[৫]

তা যদি হয় তবে জ্ঞান সর্বস্ব জিনিস সাহিত্য থেকে আপনি বাদ পড়ে যায়। কারণ ‘ইংরেজিতে যাহাকে ট্রুথ বলে এবং বাংলাতে যাহাকে আমরা সত্য নাম দিয়াছি অর্থাৎ যাহা আমাদের বুদ্ধির অধিগম্য বিষয়, তাহাকে ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব বর্জিত করিয়া তোলাই একান্ত দরকার। সত্য সর্বাংশেই ব্যক্তি নিরপেক্ষ শুভ্র নিরঞ্জন।’ ‘সমী ও দীপ্তি’ গ্রন্থের সাতটি প্রবন্ধ ছাড়াও এই সিরিজের আরও পাঁচটি প্রবন্ধ ছড়িয়ে ছিল বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। ঐ প্রবন্ধগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল।

প্রবন্ধগুলি হল যথাক্রমে —

১) ‘পরিচয়’— ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় এটা প্রকাশিত হয়।

২) ‘সমালোচনা’ — ১৩৩৫ সালে ভাদ্র সংখ্যায় ‘উত্তরা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৩) ‘মধ্যবর্তী’ — ১৩৩৫ সালের আশ্বিন সংখ্যায়‘ উত্তরা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪) ‘পৃথিবীর পথে’ — ১৩৪১ সালের বৈশাখ সংখ্যায় ‘উত্তরা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৫) ‘সবজান্তা’ — ১৩৪৭ সালের আশ্বিন সংখ্যায় ‘উত্তরা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

‘পরিচয়’ —

‘পরিচয়’ নামক প্রবন্ধটিতে দেখা যায় শীতের দিনের দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলেছে এমন এক অপরাহ্ন বেলায় সমী ও দীপ্তির মধ্যে একটি বিষয় মত বিনিময় হচ্ছিল। সেই মত বিনিময়ের মোড়কেই আশালতা প্রবন্ধটিতে সাহিত্যের সমালোচনা, সাহিত্যিকদের পরিচয় প্রদান কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

দীপ্তি জানায় — ‘সমীর এক বন্ধু বড় বড় ব্যক্তির পরিচয় প্রদান করেছে এবং তা পড়ে দীপ্তির বেশ ভালো লেগেছে কারণ বড় বড় ব্যক্তির ‘নিকট সান্নিধ্যের আনন্দ’[৬] পাওয়া যখন সম্ভব না তখন তাদের বিশেষ ধরণ, হাস্যালাপ এ সবের মাঝে যে পরিচয় ধরা পড়ে তা থেকে তাদের খানিকটা জানার আকাঙক্ষা থাকে আর সমীর ঐ বন্ধুটি সেই আকাঙ্খাই পূরণ করেছেন। কারণ শুধু মুখের কথা খবর দেয়

মাত্র কিন্তু 'আন্তরিক অনুভব মানুষকে উদ্বেলিত করত পারে।'[৭] আর তাই সমীর ঐ বন্ধুটির বিশাল হৃদয় এবং সুগভীর প্রতিভার প্রতি তার একান্ত আসক্তি তার লেখার মাঝে উন্মুক্ত করে প্রকাশের প্রচেষ্টায় সর্বস্থানে আবেগ সঞ্চার করেছে। দীপ্তির এই ভালালাগার রেশের প্রতি কটাক্ষ করেই সমী বলে যে — 'স্ত্রীলোকের স্বভাবই এই যে তারা স্কুলের ভিতর সূক্ষ্ম এবং সহজ কথার মাঝে নিগূঢ় তাৎপর্য অনায়াসে বার করতে পারে।'[৮] দীপ্তি এর উত্তরে জানায় যে মেয়েরা তাদের স্বাভাবিক ক্ষমতার বলেই সাধারণ বাস্তব বিষয়ের মাঝেও তার বিশেষত্ব এবং অশোভনের মধ্যে থেকেও তার ভেতরের সৌন্দর্যটুকু নিতে পারে।

মানুষ তার জীবনের গভীর অনুভূতি দিয়ে নিবিড় ভালোবাসা দিয়ে অন্যের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে তাই যার লেখার সাথে এই প্রীতিময় শ্রদ্ধা জড়িয়ে থাকে তাদের লেখাই হৃদয় স্পর্শ করে। আর এভাবে প্রকাশ করতে হলেও শক্তির প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিগত আমি-কে অতিক্রম করে অন্যের হৃদয়কে স্পর্শ করা সহজ ব্যাপার নয়। ব্যক্তিগত আমিকে অতিক্রম করে সুদূর নির্লিপ্ততা এবং পরিচ্ছন্নতার মূল্য কম নয়।

শুধু মহান সাহিত্যিকদের পরিচয় তথা ব্যক্তিত্বের স্বরূপ প্রকাশ করাই নয়, উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণ প্রসঙ্গেও সমী ও দীপ্তি আলোচনা করছিলেন। সমীর মতে 'যারা চরিত্র সৃষ্টিতে অপূর্ব, তারা হয়ত সর্বত্র বাস্তবের উপর নির্ভর করেন না, তার সহিত, তাঁদের শিল্পীচিত্তের কল্পনা নিজের স্থান করে নেয়।'[৯] আর এই নির্মাণ করতে গিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের সাথে শিল্পীদের ব্যক্তিত্ব মিশে যায় না। প্রকৃতপক্ষে শিল্পীর সব থেকে বড় সাফল্য এখানেই যে তিনি নিরপেক্ষ হয়ে তাঁর সৃষ্টি করেন। চরিত্রকে সে ছেড়ে দেয়, চরিত্র নিজেই যেভাবে যে পথে এগোয় শিল্পী সেটাই লিখে চলেন।

সমীর বন্ধুর লেখনীর মাঝেও এমনই কিছুর সন্ধান দীপ্তি পেয়েছে যার জন্য তার লেখা, সমালোচনা দীপ্তিকে মুগ্ধ করেছে।

'সমালোচনা' —

'সমালোচনা' নামক প্রবন্ধটিকে সাহিত্য সমালোচনার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন প্রবন্ধিক আশালতা সিংহ। সমীর বলছেন সমালোচনা এক প্রকার সৃষ্টি। দীপ্তিও এ প্রসঙ্গে বলেন যে শিল্পীর কাজই হল বীজ বুনে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে ভেতরে ভেতরে প্রকাশের যে ব্যাকুলতা তাকে জাগিয়ে দেওয়া। বড় আর্টের কাজই হল প্রত্যেক পাঠকের গ্রহণ ক্ষমতায় এবং ব্যক্তিত্বের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে সৌন্দর্য স্থাপন করা, প্রত্যেক লেখকের লেখনী যেমন আলাদা আলাদা তেমনি তার পাঠকও হয় বিভিন্ন প্রকৃতির।

আর্টকে কেউ কখনো absolute করে গ্রহণ করতে পারেননি তাই একেকভাবে সে একেক জনকে প্রভাবিত করে। ''...মর্ম্মস্থানের সেই সৌন্দর্যকম্পনকে অপরের অনুভবগম্য করে তোলাই সমালোচকের কাজ।''[১০] দীপ্তি আরও জানায় যে, নৈব্যক্তিক, ইম্পার্সোনাল এসব কথা শুনতে ভালো লাগলেও স্থির হয়ে বুঝতে বসলেই বিস্তর জটিলতা দেখা দেয়। বেশিরভাগ মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না, কিন্তু প্রকাশের আবেগ তাদের মধ্যেই বেশি রয়েছে তাই এই প্রকাশ ব্যাকুলতা যখন সেই পাঠ কোন আর্টিস্টের সৃষ্টির মাঝে ছন্দময় রূপে দেখে তখনও সে আনন্দ লাভ করে। অর্থাৎ পাঠকের ক্যাথরিসিস ঘটে।

কোন একজনের চৈতন্য এবং মনোবৃত্তির ওপর সৌন্দর্য যে ধরনের প্রভাব ফেলে তাকে সুচারুপে প্রকাশ করাই হল সমালোচনা। এদিক থেকে বলা যায় সমালোচনাও এক ধরনের সৃষ্টি। ললিতকলাকে ভালোবাসা শুধু নয় তাকে ভালোমত বুঝতে পারা তথা গ্রহণ করা ক্ষমতা-অক্ষমতা নিয়েও ভাবা প্রয়োজন।

সমালোচনাও যে এক প্রকার সৃষ্টি তার কারণ হল সমালোচক তার যে সৌন্দর্যসুখ এবং তীব্র অনুভূতি তা সে অনেকের অনুভব গোচর করে তোলেন। আর ললিতকলাকে বোঝার একমাত্র উপায় হল আর্টকে ভালোবাসা এবং মানুষকে ভালোবাসা। এই একটা উপায় ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই। তবে এটাও খেয়াল রাখা দরকার যে অনুরাগ মোহের বাষ্পে অনেক সত্য যেন আচ্ছন্ন না হয়।

ভালোবাসা এবং সংসক্তি যদিও এক বস্তু নয়। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর পঞ্চভূত প্রবন্ধেও বলেছিলেন —

> ''আমার কি এত স্নেহ আছে যে, তুমি বাস্তবিক যতখানি আমি তোমাকে ততখানি দেখিতে পাইব? একটি মানুষের সমস্ত কে ইয়ত্তা করিতে পারে?''[১১]

অর্থাৎ মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে তার সৌন্দর্য বিকাশের ধারা অনুভব করতে হলে তার প্রতি স্নেহ এবং সম্ভ্রম — দুটোই খুব বেশি পরিমাণে প্রয়োজন।

প্রাবন্ধিক আশালতাও তাই বলেছেন যে, এত শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা নেই বলেই আর্টের সমগ্রতাকে কেউ তেমনভাবে ইয়ত্তা করতে পারেননি। শিল্পী তার জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনা আনন্দ দিয়ে যাকে সৃষ্টি করেছেন তার মানস জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশনাকে তিনি যে সীমাহীন স্নেহের চোখে দেখেছেন অত স্নেহ আমাদের কোথায়?

এর সঙ্গে এও ঠিক যে একজনের মানসলোকের বস্তু আর সবার আকাঙ্ক্ষার বিষয়। তাই সৃষ্টির প্রতি আগ্রহ এবং কৌতূহল অত্যন্ত স্বাভাবিক। সমালোচক শুধু তো সুন্দরের প্রতিই মানুষের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে না। সে সাহিত্য জগতে নীতিরক্ষা করে এবং অসুন্দর সাহিত্যের প্রভাব থেকে জনসাধারণকে

সতর্ক করে। নীতি সম্বন্ধে কথা বলা যদিও খুবই কঠিন। কারণ নীতির অনেকাংশ নির্ভর করে বলার ধরনের উপর।

জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজেও Proportion এবং harmony'র ওপর আকাঙক্ষা মানুষকে অনেক অসৌন্দর্যের হাত থেকে রক্ষা করে যা নীতিশাস্ত্রের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকে না। তাই —

> ''... নীতি বিচার আশ্রয় করে যে সমস্ত তুমুলতা, কলরোল, এবং বাদ প্রতিবাদের সৃষ্টি হয় তাতে শান্তি এবং সৌন্দর্যের চেয়ে অনাবশ্যক বিবাদের ভাগ বেশি।'[১২]

আর সেজন্যই সমালোচকের কাজ হওয়া উচিত সৌন্দর্য আবিষ্কার করা এবং সেই সৌন্দর্যের প্রতি পাঠককূলের আকাঙ্খা জাগিয়ে তোলা।

আমাদের মনে পড়বে আশালতা সিংহের লেখা নিয়ে শনিবারের চিঠি, বাতায়নিকের পত্র - এঁরা অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করেন। নীতি-নৈতিকতার প্রশ্ন তুলে আশালতার লেখায় তাঁরা শুধু কদর্যতাই খুঁজে পান। ঐ সমালোচনার জবাবেই সম্ভবত লেখিকা অত্যন্ত মার্জিত ভাষায় এর উত্তর দেবার প্রয়াসী হয়েছেন এবং তিনি দেখান যে সমালোচনা কেমন হওয়া উচিত।

'মধ্যবর্ত্তী' —

'মধ্যবর্ত্তী' প্রবন্ধটিতে তিনটি পুরুষ এবং একটি নারী চরিত্রের কথা আলাপচারিতায় একাধিক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটিতে বর্ষা ঋতুর প্রসঙ্গ এসেছে। বর্ষা যে প্রতিটি মানুষের জীবনে বিশেষত শিল্পী মনের মানুষদের নানাভাবে প্রভাবিত করে সে কথাই জানিয়েছেন প্রাবন্ধিক।

যে কয়েক জনের মধ্যে বর্ষা ঋতু নিয়ে আলাপচারিতা হচ্ছিল তারা হল — বিনয়, সতীশ, সুরেশ এবং ললিতা। বিনয় এবং ললিতা নাম দুটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' উপন্যাসের দুটি নাম, সতীশ শরৎচন্দ্র চেট্টোপাধ্যায়ের 'চরিত্রহীন' এবং সুরেশ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'গৃহদাহ' উপন্যাসের থেকে নেওয়া চরিত্রের নাম। বোঝাই যাচ্ছে আশালতা রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন।

বিনয় বাইরের বৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলল যে —

> ''সংসারে একটা তৃতীয় শ্রেণী রয়েছে তারা সাধারণের দলগত নয় এবং তাদের মাঝে সৃষ্টি ক্ষমতা এত বিশেষ এবং অনিবার্য্য হয়ে দেখা দেয় নাই, ...''[১৩]

এবং বিনয়ের মতে এই মধ্যবর্তী শ্রেণী না থাকলে পৃথিবীর অনেক ক্ষতি হত।

সুরেশও বলে যে সাহিত্যে কর্মকে তিনি যদিও বড় মনে করেন না তথাপি তাঁর এও মনে হয় যে সুন্দর ভাষার ভিতর দিয়ে একটা ভাব কিংবা আইডিয়াকে প্রকাশ করা যেন অনেকটা কৃত্রিম এবং অভ্যাসগত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যদিও ললিতার মতে কথা দিয়ে আবেশ সৃষ্টির চেয়ে চিন্তা এবং আইডিয়ার গুরুত্ব যথেষ্ট বেশি।

বিনয় এ প্রসঙ্গে বলেন যে কর্মের সাথে চিন্তার সমন্বয় ঘটলেই সার্থকতা আসে। 'এইচ. জি. ওয়েল্‌স -এর 'Passionate Friend' এমনই এক সাহিত্যিক নিদর্শন। মধ্যবর্তী প্রবন্ধটির আঙ্গিক অভিনব। আলাপ-চারিতায় যে সমস্ত চরিত্রদের পাচ্ছি তারা গল্প -উপন্যাসের মতোই সজীব চরিত্র। মানবিক অনুভূতিতে পূর্ণ চরিত্রগুলির সাবলীল তর্ক বিতর্কে প্রবন্ধটি স্বচ্ছন্দে এগিয়ে গেছে মূল বক্তব্যের লক্ষ্যে।

'পৃথিবীর পথে' প্রবন্ধটি আশালতা সিংহ বুদ্ধদেব বসুর লেখা কাব্যগ্রন্থ 'পৃথিবীর পথে' কাব্যগ্রন্থটির সমলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন। এই প্রবন্ধে সমী ও দীপ্তি ছাড়াও ক্ষিতি নামক একজনের আবির্ভাব হয়েছে। এদের তর্ক বিতর্কের মোড়কেই আশালতা তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন প্রবন্ধটিতে।

বাংলা কবিতা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে দীপ্তি বলেন যে কবিতা পড়বার জন্য একটি বিশেষ আবেগ যেমন প্রয়োজন তেমনি একটি বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতিরও আবশ্যক। মডার্ন কবিতা সম্বন্ধে দীপ্তির মত হল —

> ''... যে কবিতা বহি ফ্যানের তলায় কেদারায় বসিয়া চা খাইতে খাইতে ঘন্টা খানেকের মধ্যে পড়িয়া শেষ করা যায় তাহা মডার্ন কবিতা হইতে পাবে কিন্তু সত্যিকার কবিতা নয়।''[১৪]

সমী'র বকলমে আশালতা বলেন যে —

> ''আজকালকার বহু লোকের মত তুমি যে দেখিতেছি মডার্ন কথাটার উপর ঠেশ দিতে পারিলে আর কিছু চাও না।''[১৫]

যদিও দীপ্তি এ কথাকে আমল দেয় না। দীপ্তির মতে ভালো কবিতা সেটাই যা পড়বার পরও মনের উপর একটি মুগ্ধ করুণ মায়া বিস্তৃত হয়ে থাকে। একথার সায় দিয়ে সমীও বলেন যে, নীতিকবিতায় কবি নিজেই সব বলে দেন না, কারণ তাতে বলার চেয়ে ব্যঞ্জনাই থাকে বেশি। আর ''তাই একটি বিশেষ অনুকূল মনোভাব সৃজিত না হইয়া উঠিলে যত্র তত্র যখন তখন ভালো কবিতা পড়িয়া সুখ পাওয়া যায় না।''[১৬]

দীপ্তি এ প্রসঙ্গে বলেন যে —

> ''শ্রী বুদ্ধদেব বসুর পৃথিবীর পথে পড়িয়া মনে হইল অনেকদিন পরে এমন একটি বই পড়িলাম। যে কবিতার বই আস্তে আস্তে মনের নানা অস্ফুট কুজনের সহিত মিলাইয়া একটু একটু করিয়া পড়া যায়।''[১৭]

সমী বলেন যে কবিতাগুলো পড়ে মনের মধ্যে একটি বিশেষ অনুভূতিময় জগৎ ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। বস্তুত, বুদ্ধদেব বসুর 'পৃথিবীর পথে' গ্রন্থখানি অনুভবের তীক্ষ্ণতায়, মাধুর্যে এবং ভাবের গভীরতায় শ্রেষ্ঠতম হয়েছে বলা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক সমী-র মুখ দিয়ে বলান যে, যেমন শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পূরবী', 'বনলতা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতা শক্তি এবং দার্শনিকতায় শ্রেষ্ঠ হলেও 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের বেশ কিছু কবিতা মনকে বেশি করে স্পর্শ করে, এও তেমনি। এর কারণ স্বরূপ দীপ্তি বলেন যে, 'মানসী'র কবিতাগুলির মধ্যে যেসব সমীরের বেশি ভালো লাগে সেগুলি সবই প্রেমের কবিতা। প্রেমের কথা, প্রেমের ব্যথা ধরণীর চেয়ে ও বেশি বয়সী এবং আকাশের চেয়েও পুরোনো বলেই যথার্থ প্রেমের কবিতা লেখা নিরতিশয় দুরূহ ব্যাপার। আর বুদ্ধদেব বসুর 'পৃথিবীর পথে' পড়ে নিঃসংশয়ে বলা যায় প্রেমের কবিতা বলে তিনি যে এদের অভিহিত করেছেন তা সার্থক হয়েছে।

'পৃথিবীর পথে' কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুরই লেখা 'বন্দীর বন্দনা', 'একটি কথা' গ্রন্থ দুটিরও তুলনা করেছেন আশালতা। প্রাবন্ধিকের মতে, 'বন্দীর বন্দনা'য় প্রায় সব কবিতায় মূল সুরের মাঝে অশ্রুকরুণ অভিমানাহত বিদ্রোহের সুর আছে কিন্তু 'পৃথিবীর পথে'-তে সেটাই স্নিগ্ধ মধুর ভাবে কমনীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে।

বন্দীর বন্দনা'র একটি কবিতা থেকে —

> '' যেথা যত বিপুল বেদনা
> যেথা যত আনন্দের মহান মহিমা
> আমার হৃদয়ে তার নব নব হয়েছে প্রকাশ!
> বকুল বীথির ছায়ে গোধূলির অস্পষ্ট মাথায়
> অমাবস্যা পূর্ণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত।''

আবার 'পৃথিবীর পথে' কবিতাতে তিনিই লেখেন —

> ''নক্ষত্রের আলো যদি উজ্জ্বল দৃষ্টির দীপ মনে নাহি আন,
> একটি সলজ্জ কথা করিয়া স্মরণ
> নক্ষত্র সভায় বসি ক্ষীণতার বসুন্ধরা না হয় উন্মন —

তবে ওর রাত্রি আর সুদূর তারার আলো — সব নিরর্থক।''

তাই আশালতার মনে হয়েছে 'পৃথিবীর পথে' কাব্যগ্রন্থে তিনি যেন নিজেই অভিভূত হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর কবিতাগুলি লিখেছেন। এই কবিতা গুলিতে যা আছে তা কবির একেবারে গোপনতম গভীর তম মনের কথা। তাই একথা একান্তে নিভৃতে কেবল বিশেষ একজনের কানে কানে বলবার কবিতা।

'সবজান্তা' —

প্রাবন্ধিক আশালতা সিংহ বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি, আধুনিক মানুষের খবরের কাগজের প্রতি অত্যাধিক প্রীতিবশত যে অন্তরের অসারতা, ব্যর্থতা তা 'সবজান্তা' প্রবন্ধটির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা পরিকল্পনার বাস্তব দিক যতই থাকুক মানুষের অন্তরের রসবোধ এতে উপেক্ষিত হচ্ছে। যে শিক্ষার বলে মানুষ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতার রসাস্বাদ করতে পারে কিংবা শরৎ সাহিত্য উপলব্ধি করতে পারে সেই শিক্ষা মানুষ পায় না। আশালতার বিশ্বাস —

> ''তবে আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি যেভাবে দেওয়া হয় তাতে
> প্রাণবন্ত সক্রিয় মন গড়ে উঠবার সাহায্য করে না ....'[১৮]

মানুষ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে যাবতীয় জ্ঞান এক নিমেষে গলাধঃকরণ করবার চেষ্টা করছে, কোন বিষয়ের গভীরে না ঢুকে শুধু ওপরে ওপরে সমস্ত কিছু জেনে নেবার চেষ্টা চালাচ্ছে।

মানুষ সবজান্তা হবার প্রয়াসে শুধু এটা এক কামড় সেটা এক কামড় — 'এভাবে যেন সমস্ত কিছু ঢেকে বেড়াচ্ছে। 'কে, কি, করে, কেন, কোথায়?'[১৯] — এটুকু জানলেই যেন সব জানা হয়ে গেল। মানুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময়টুকু দিতে চায় না। সবাই কেবল ছুটছে। এত জানার ধাক্কা সামলাতে মানুষ নিজেকে জানারই অবসর পাচ্ছে না।

'সমী ও দীপ্তি' প্রবন্ধ গ্রন্থটি ছাড়া আশালতা সিংহের অগ্রন্থিত প্রবন্ধের সাতাশটি এখনও পর্যন্ত পাওয়া গেছে, প্রকাশের তারিখ বিবেচেনা করে প্রবন্ধগুলি হল যথাক্রমে —

১) 'নারী' — 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা।

২) 'পরিচয়' — 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা।

৩) 'নারী' — 'বিচিত্রা' পত্রিকা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা।

৪) 'বার্ট্রান্ড রাসেল ও অতীন্দ্রিয়বাদ' — 'বিচিত্রা' পত্রিকা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা।

৫) ‘শরৎচন্দ্র ও গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি’ — ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকা ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা।

৬) ‘সমালোচনা’ — ‘উত্তরা’ পত্রিকা ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা।

৭) ‘মধ্যবর্ত্তী’ — ‘উত্তরা’ পত্রিকা ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা।

৮) ‘নারী’ — ‘বিচিত্রা’ পত্রিকা ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা।

৯) ‘শ্রী বুদ্ধদেব বসু এবং বাস্তবতা’ — ‘পুষ্পা পাত্র’ পত্রিকার ১৩৪০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা।

১০) ‘গোরা ও কুমুদিনী’ —‘ জয়শ্রী’ পত্রিকা ১৩৪০-এর শ্রাবণ সংখ্যা।

১১) ‘পথের পাঁচালী ও অপরাজিত’ — ‘জয়শ্রী’ পত্রিকা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা।

১২) ‘শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব’ — ‘উত্তরা’ পত্রিকা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা।

১৪) ‘বাংলা সাহিত্যে আধুনিক লেখক’ — ‘জয়শ্রী’ পত্রিকা, ১৩৪১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা।

১৬) ‘রবীন্দ্রনাথের আধুনিক লেখা’ — ‘জয়শ্রী’ পত্রিকা, ১৩৪১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা

১৭) ‘সাহিত্যের স্টাইল’ — ‘জয়শ্রী’ পত্রিকা, ১৩৪১ এর মাঘ সংখ্যা।

১৮) ‘অনামী’ — ‘জয়শ্রী’ পত্রিকা ১৩৪১

১৯) ‘সাহিত্যে অবহেলা’ — ‘বিচিত্রা’ পত্রিকা ১৩৪৬ এর আষাঢ় সংখ্যা

২০) ‘সবজান্তা’—‘উত্তরা’ পত্রিকা, ১৩৪৭ এর আশ্বিন সংখ্যা

২১) ‘প্রবাসিনী’ — ‘যুগান্তর’ পত্রিকা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যা

২২) শিশিরের মর্মবাণী — ‘মাসিক বসুমতী’ ১৩৬২ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যা

২৩) ‘সতীনাথ ভাদুড়ী’ — ‘অমৃত’ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা

২৪) ‘ভাগলপুরের স্মৃতি’ — ‘স্মরণী’ ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ

২৫) আমাদের ভাগলপুরের শরৎচন্দ্র — ‘স্মরণী’ পত্রিকা ১৯৭৫ এর ডিসেম্বর

২৬) শরৎচন্দ্র ও নারীমুক্তি — ‘বীরভূমি’ পত্রিকা, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ

২৭) 'কল্লোল যুগ' — কথাসাহিত্য পত্রিকা ১৩৮৮ এর কার্তিক সংখ্যা।

'নারী' (১ম) —

শ্রীমতী আশালতা সিংহ তাঁর নারী প্রবন্ধ (১ম) টিতে জানান - প্রাচীন গ্রীস সহ অন্যান্য দেশে এই তথ্যটি প্রতিষ্ঠা পায় যে, নারী পুরুষের প্রতিভাকে প্রেরণা দান করে, পুরুষের সৃষ্টির কাজে নারী লাবণ্য একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী হলেও সিদ্ধান্ত হয় যে, সৃষ্টি করার ক্ষমতা নারীর নেই। এর প্রমাণ হিসাবে দেখানো হয় যে মেয়েরা ''... সাহিত্যে, ললিতকলায়, সঙ্গীতে মৌলিক কিছু দিতে পারেনি, এই তার অকাট্য প্রমাণ।''[২০] যদিও একজন নারী হিসাবে এ কথা স্বীকার করতে আশালতার বাধছে। কারণ হিসাবে আশালতা জানান যে, প্রতিভা থাকলেও ''...সৃষ্টি করে দিতে হলে বহু দিনের সাধনা প্রয়োজন।''[২১] আর এই সাধনা—অনুশীলনের সময়ই মেয়েরা পায় না। সুযোগ এবং অবসর কোনটাই মেয়েরা পায় না। শরীর বিজ্ঞান তার প্রমাণ প্রয়োগ নিয়ে এসে বলেছে ''পুরুষের 'ব্রেনের ওজন' নারীর চেয়ে বেশি''[২২] যদিও বর্তমানে এ তথ্য ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

কোন বিষয়ে সাধারণ একটা জ্ঞান চর্চা করতে হলেও সেই বিষয়ের শেষ তল অবধি বোঝবার চেষ্টা করা মেয়েদের হয়ে ওঠে না। কারণ মেয়েরা বর্তমানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেন না। উপস্থিত মতো স্বজন, প্রতিবেশিকে সুখী করতে পারলেই তারা সন্তুষ্ট বোধ করে থাকেন।

বহু শতাব্দী থেকে সাহিত্য জগতে পুরুষেরাই প্রধান স্থানটি অধিকার করে আছে। শুধু তাই নয়, সাহিত্য কীভাবে লেখা হবে সেটাও ঠিক করে দেয় পুরুষেরাই যেহেতু বিষয়টি বহুদিন থেকে তাদের দখলে রয়েছে। খুব স্বাভাবিবকভাবেই পরবর্তীকালে যেসব মেয়েরা লিখতে এসেছেন তাঁরাও পুরুষ লেখক দ্বারা কম বেশি প্রভাবিত হয়েছেন। সর্বোপরি — ''গৃহকাজে, সংসারের সর্বত্র একটি স্নিগ্ধ ব্যাপ্তিতে প্রতিভার পরিশীলন হয় না।''[২৩]

এটাই শোনা যায় যে, স্ত্রীলোকের নবনিযুক্তির ক্ষমতা নেই এবং বিশুদ্ধ চিন্তা যা বর্তমান নয় এমন উচ্চ পর্যায়ের গণিত, বিজ্ঞান জাতীয় কোন অ্যাবস্ট্রাক্ট বিষয়ও তারা চর্চা করেন না। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানের ওপর মেয়েদের অধিকার নেই — এমন কথাও তো মানা যায় না। আশালতা ক্ষোভের সঙ্গে এও জানাচ্ছেন যে —

> ''প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জগতে নারী সম্বন্ধে যাঁরা ভেবেছেন তাদের সবারই সিদ্ধান্ত — নারীর কাজ সৃষ্টি নয়, এই জন্যই প্রকৃতির দরবারে তার অক্ষমতা বহু পূর্বেই ঠিক হয়ে গেছে।''[২৪]

অথচ খুব সাধারণ পুরুষেরও নিজের গৃহে সম্মান আছে যতই সমাজে তার সম্মান কম থাক। নিজের গৃহে যে সেই ব্যক্তি সম্মান পান তার কারণ হল গৃহের শিল্পী একজন নারী।

নারীরা পৃথকভাবে কিছু সৃষ্টি করতে না পারলেও সন্তানের জন্ম এবং তাকে পালনের মধ্য দিয়ে তার যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব তা সে জগৎকে দান করার চেষ্টা করে — কিন্তু এসব শ্রেষ্ঠত্ব তেমনভাবে স্বীকৃতি পায় না পুরুষতান্ত্রিক সমাজে।

অন্যদিকে পুরুষের সৃষ্টি শক্তির ওপর কখনো কখনো নারী লাবণ্য বিস্তর প্রভাব বিস্তার করলেও সর্বত্র তা করে কি না সে নিয়েও যথেষ্ট সংশয় রয়ে গেছে। কারণ সব শ্রেণীর পুরুষের মনোবৃত্তির উপর এই প্রভাব কাজ করে না।

এতদিন অবধি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বলে এসেছে — নারীর কাজ তার গৃহকে, তার অস্তিত্বকে, স্বজন এবং প্রতিবেশীদের সাথে বহু দিক দিয়ে বিভক্ত জটিল সম্বন্ধকে সুন্দর, কোমল করে রাখা। আর এই কোমল সুন্দর হতে গিয়েই নারীকে বহু ছলনা, অনেক প্রিয় মিথ্যা বাক্য বলতে হয়েছে, প্রচুর অভিনয়ও করতে হয়েছে। তাই বলা যায়, সমাজ সংসার এতদিন নারীর কাছে সত্য শুনতেই চায়নি।

'নারী' (২য়) —

'নারী' নামে দ্বিতীয় প্রবন্ধে নারী বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আলাপ-আলোচনা 'প্রবাসী' পত্রিকার পাতা খুলে চোখে পড়ায় প্রাবন্ধিক আশালতা সিংহের যা মনে হয়েছে তা তিনি নারী নামক দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে বলতে চেয়েছেন। শুধু কবিগুরুর নারীদের নিয়ে আলোচনাই নয় কিছুদন আগে এক লেখক 'একটি সমস্যা' নামে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন যাতে ইউরোপীয় এক তরুণীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে বসে তিনি নারীদের equating নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। যাকে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে charm এবং বাংলায় হ্লাদিনী শক্তি বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রাবন্ধিক আশালতা জানাচ্ছেন মেয়েরা তাদের সমস্ত কার্যকলাপের ওপরই অপ্রকাশ্যতার আবরণ দিতে চান। কিন্তু বর্তমান সময়ে সাইকোএনালিসিস এর জোয়ারে সব আবরণই ভেদ করে আসল মূর্তিটি উন্মোচিত হচ্ছে।

আমাদের মনে পড়বে এ প্রসঙ্গে পিটারসেন এবং রাদার ফোর্ড ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত তাঁদের বইয়ে ব্যবহার করলেন — 'double colonisation : Colonial and Post Colonial Women's Writing' এ জানালেন যে ঔপনিবেশিক নারী আসলে দু-দুবার নিষ্পেষিত হয় — ঔপনিবেশিক শাসক এবং দেশীয় পুরুষতন্ত্র — এই দুই নিষ্পেষণ যন্ত্রের কোনওটির থেকেই রেহাই নেই তার।

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকও তাঁর প্রবন্ধ 'Can the Subaltern Speak'তে প্রশ্ন করেছেন সাবঅল্টার্নের পক্ষে কি নিজের কণ্ঠে কথা বলা আদৌ সম্ভব? মহিলা সাবঅল্টার্নের পক্ষে বোধ হয় সেটা আরও বেশি অসম্ভব।

প্রাবন্ধিকের মতে, ''নারী যে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে তার অস্তিত্বের মাধুর্যকে নিরন্তর ব্যক্ত করতে চাইছে — এটাই তার হ্লাদিনী শক্তি। কারণ মানুষ যেমন করে প্রত্যাশা করে তার প্রত্যাশার দান তেমনি কর তার কাছে আসে।''[২৫] মেয়েরা যখন দেখে পুরুষ বরঞ্চ আবেগের ভেতর দিয়ে অতিশয়োক্তি করে ঠকতে রাজি আছে কিন্তু অহোরাত্র সুতীক্ষ্ণ বিচারভারে তাদের দৃষ্টির আবেশ এবং মাধুর্যটুকু নিঃশেষ করতে চায় না তখন নারীর তার নিজের মাঝে যেখানে যেটুকু অসুন্দরতা আছে তাকে ঢেকে গোপন করে হাসি দিয়ে কথা দিয়ে কর্ম-কুশলতার দ্বারা একটি বিশেষ মাধুর্য প্রকাশ করে। নিজেকে সুন্দর করে প্রকাশ করার এই চেষ্টা শুধুমাত্র নারীরই নয়, পুরুষেরও। কারণ নিজেকে সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারলে মানুষ নিজেও খুশি হয়ে ওঠে।

তাই পুরুষরাই শুধু নারী লাবণ্য প্রত্যাশা করে না। ''স্ত্রীলোকও পুরুষের কাছে এই জিনিসই দাবি করতে পারে। পরস্পরের কাছ শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম এবং চেষ্টা করেও নিজেকে মধুর করে প্রকাশ করার কামনা এইটেই পুরুষের ব্যক্তিত্বকে জাগ্রত এবং উদ্বোধিত করে এবং নারীকেও বিশেষ তৃপ্তি দেয়। অথচ এমন বিপজ্জনক কথা বলাও উচিত নয়।''[২৬]

প্রাবন্ধিক আশালতা বলেন আবেগ বস্তুটি ভালো হলেও সংযত আবেগ তার চেয়েও ভাল। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ রয়েছে তাকে অস্বীকার না করেও সংযত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অনেক সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায়।

আশালতা যে কত প্রগতিশীল ছিলেন তার পরিচয় পাই যখন তিনি বলেন —

> 'Traditional morality'র উপর আমার এতটুকু স্পৃহা নই। বর্তমানকালে জোর করবার দিন চলে গিয়েছে।'[২৭]

আর তাই আশালতার মনে হয়েছে Traditional Morality-র স্থান যদি artist temperment দিয়ে পূর্ণ করা যায় তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না কিন্তু জীবন মাধুর্যে ভরে যায়। আশালতা মনে করেন - যাঁরা অনুভব বেশি করেন এবং সংবরণ বেশি করেন তাঁরাই যথার্থ সংযত। রবীন্দ্রনাথের নারী বিষয়ক আলোচনা পড়ে আশালতা জানাচ্ছেন ঐ আলোচনায় কবিগুরু বলছেন ''পাশ্চাত্য সমাজে পুরুষ প্রকৃতি বিকাশের অনুকূল সেই নারী শক্তি সর্বত্র ব্যাপ্তভাবেই আছে''[২৮] তাই সেখানকার পুরুষরা উদ্যমশীল।

এবারে প্রশ্ন উঠেছে — প্রাচীন গ্রীস, রোম, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে পুরুষের কর্মশক্তিতে দুর্বল

ছিল না এবং তখন সমাজের সর্বত্র নারী কিরণও ছড়িয়ে ছিল না। তা ছিল না ঠিকই কিন্তু সেই সময় এক শ্রেণির মেয়ে ছিল যাঁরা আলাপ আলোচনার তরঙ্গ তুলে পুরুষের মানসিক রাজ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার করতেন।

'মৃচ্ছকটিক' নাটক থেকেই জানা যায় এমনই এক মেয়ে ছিল বসন্তসেনা। এ ধরনের মেয়ে সাধারণ পণ্য স্ত্রীদের সঙ্গে তুলনা করলে ভুল করা হবে কারণ শোনা গেছে বসন্তসেনা এবং চারুদত্তের পরস্পরের সম্বন্ধের ভিতরে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের অভাব ছিল না।

অসামাজিক প্রণয় শুধুমাত্র কাব্যলোকেই স্থান পেয়েছে কিন্তু বাস্তবে তাকে হীন চোখেই দেখা হয়। অথচ প্রাচীন সাহিত্য থেকে জানতে পারা যাচ্ছে যে সেই সময় তাকে হীনভাবে দেখা হত না। পুরুষেরা অশ্রদ্ধা করতে চাইত না বলে বড় করে পাবার সুযোগ পেত এবং স্ত্রীলোকেরাও নিজেদের উপর বিতৃষ্ণা করার গ্লানির ভারে প্রতিদিন নীচে নেমে যেত না।

সমাজেও নারী এবং পুরুষের মধ্যে একটা উন্মুক্ত এবং সহজ যোগ থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। এরকম হলেই মানসলোকের সৌন্দর্য সৃজন অনায়াসে এবং আত্মবিস্মৃতভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব।

প্রাবন্ধিক আশালতা সিংহের 'নারী' শিরোনামে দুটো প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করা হল।

'নারী' (৩য়) —

আশালতা সিংহের নারী বিষয়ক ঐ দুটি প্রবন্ধ পাঠ করে আমাদের সমাজের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। একথা জানতে পেরে স্বয়ং আশালতা জানান যে, সত্য কথা সহজ করে বলতে বসলে সেটা কিছু পরিমাণ দুঃসাহসিক হয়ে দাঁড়ায়।

নারী সম্বন্ধে প্রাবন্ধিক আশালতা পূর্ব প্রবন্ধগুলিতে যা বলেছিলেন তা হল — সৃষ্টি কার্যে নারীর অবদান কম থাকার কারণ সংস্কার, যুগান্তের সঞ্চিত বাধা প্রতিকূলতা অথবা বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে এর কারণ লুকিয়ে থাকলেও এ সমস্ত কারণকে অতিক্রম করার চেষ্টা করা নারীর প্রয়োজন কিনা তা পুনর্বিবেচনা করা বিশেষ প্রয়োজন।

মহিলাদের কাছে পুরুষ যা আশা করে তা হল নারী লাবণ্য — এটাই বহুচর্তিত অথচ শুধুমাত্র নারী লাবণ্য বিস্তার করাই নারীর একমাত্র কর্ম হলে সেখানে সূক্ষ্মতা থাকে না। উপরন্তু নিজেকে উৎকষ্ট করা সৃষ্টিশীল কর্মে নিয়োগ করে নিজেকে শক্তিময়ী রূপে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে নারীর মধ্যে কোন হীনমন্যতা থাকবে না। পুরুষ-মহিলার পাশাপাশি সহাবস্থান তখন অনেক সহনীয় হবে।

মহিলারা এতদিন শুধু কোমলতার চর্চা করে এসেছে বলেই তাদের মধ্যে এখনও ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক

স্ফুরণ ঘটেনি। আর তাই মেয়েদের সৃজনশীল কাজে এগিয়ে আসতে এখন থেকে বেশি বেশি করে মননের চর্চা করতে হবে। নারীর মেধা, মনন শক্তি পুরুষের চেতনা এবং হৃদয়বৃত্তিকেও জাগিয়ে তুলতে সাহয্য করবে। স্ত্রী-পুরুষ-পরস্পরের সাহচর্যে সত্য এবং সৌন্দর্যের সৃষ্টি আরও মনোরমভাবে হওয়া সম্ভব।

পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বন্ধুত্বে সৌন্দর্যের অভাব না থাকলেও পুরুষ-নারীর বন্ধুত্বে জ্ঞানের এবং ভাবের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সাথে আরও অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের ভাব থাকে। এতদিন পুরুষ যা নারীর কাছে প্রত্যাশা করেছে এবং পেয়েছে সে জিনিস পুরুষও নারীকে দিতে পারে; তা হল প্রেরণা। এই প্রেরণা পুরুষও নারীকে দিতে পারে এবং নারী তা প্রত্যাশাও করে।

নারী পুরুষের মধ্যে sex attraction আছে তা যদি কেউ শুনতে, বুঝতে না চায় এবং এসব কথা শোনাও বিপজ্জনক মনে করেন। তাতে সৌন্দর্যময় সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হবে না বলেই প্রাবন্ধিক মনে করেন।

গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দিও মেয়েদের সম্পর্কে একথাই বলেছেন —

> "Flavour! an impalpable quality, ess ensily captured than the scent of a flower, the peculiar and most essential attribute of any work of art! Flavour, in fine is the spirit of the dramatist prejected into his work in a state of volatiity, so that no one can exactly lay hands on it, here there or anywhere." [২৯]

মেয়েরা যদি তাদের শিল্পসৃষ্টির কাজ আন্তরিক অনুভূতির সঙ্গে নিজেকে সংযত হৃদয়াচ্ছ্বাসে আবদ্ধ রেখে করে, শিল্পসৃষ্টির জন্যে যা একান্ত আবশ্যক, তা হলে সবচেয়ে ভালো হয়।

আশালতা এও মনে করেন যে বন্ধুত্বের বিষয়টি স্ত্রীলোকের স্বভাববিরুদ্ধ। এর কারণ লুকিয়ে আছে সামাজিক লৌকিকতার চাপের মধ্যে যে চাপ বেশি মাত্রায় মহিলাদের ওপরই রয়েছে। আর সেজন্য আমাদের দেশে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বন্ধুত্বের কোন অবকাশই দেখা যায় না সে জ্ঞানলোক, ভাবলোক কিংবা অন্য কোন লোকই হোক না কেন।

'বার্ট্র্যান্ড রাসেল ও অতীন্দ্রিয়তাবাদ' —

'বার্ট্র্যান্ড রাসেল ও অতীন্দ্রিয়তাবাদ' প্রবন্ধে বাট্র্যান্ড রাসেলের রচনা অবলম্বনে অতীন্দ্রিয়বাদ প্রসঙ্গে নিজের অনুভবের কথা ব্যক্ত করেছেন প্রাবন্ধিক আশালতা সিংহ। সেই সঙ্গে বার্ট্র্যান্ড রাসেলের রচনায় যে রহস্যের স্পর্শ আছে তা বলতে ভোলেননি।

শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়েব লেখা বার্ট্র্যান্ড রাসেলের কথোপকথন মডার্ন রিভিউতে বেরিয়েছিল। সেখানইে রাসেলের কিছু মতামত প্রকাশ পায়।

Cynicism মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে অনাসক্ত করে। যৌবনের পরিপূর্ণ আবেগ যখন চলে যায় সে তখন নিজের দুর্বলতা বুঝতে পারে। আর তখনই নিজেকে নিয়ে এবং পৃথিবীর ভালো মন্দ নিয়ে আবিষ্ট হয়ে থাকার সময় কেটে যায়। অসাম্য, বীভৎসতা দেখেও সে আর আগের মতো উত্তেজিত হয় না।

জীবন সম্পর্কে মানুষ যখন সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তখনই যে সে জীবনকে সবচেয়ে বেশি উপভোগ করে এ মোটেই বলা যায় না। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক আশালতার প্রশ্ন — 'কিন্তু যারা বিশ্লেষণশীল এবং সংশয়াবাদী তদের কি mysticism এর উপর অনুরাগ থাকতে নেই?'[৩০]

রাসেল অভিযোগ করেছেন যে যাঁরা mystic religious তাঁরা সমস্ত জিনিষের আইডিয়াকে খুঁজতে বসেন। আর সেজন্য সাধারণ ঘটনা থেকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেও যে আনন্দ পাওয়া যায় সেদিকটা তাঁরা বাদই দিয়ে দেন। আর এভাবে সে একা কোন গূঢ় রহস্যের সমাধান করে আনন্দ পেলে সর্বসাধারণের থেকে সে নিজেকে আলাদা করে ফেলে।

সমস্ত বস্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত অর্থ আছে এবং তা খুঁজতে বসলে স্বাভাবিক আনন্দে অনেক বাধা ঘটে। অতি ছোটখাটো ঘটনা, বাক্যে-ব্যবহারেও অনেক অপরিসীম সৌন্দর্য থাকে; পৃথিবীর এই সমস্ত বস্তুগত বিষয়কে অগ্রাহ্য করে তার ভেতরের আইডিয়াকে নিয়ে থাকলে সর্বাঙ্গীণ আনন্দ পাওয়া যায় না। অস্তিত্বের সাথে ব্যক্তিত্বের যে অংশ অব্যক্তভাবে বিকীর্ণ হয় যার মাঝে হয়তো মানুষের সত্য পরিচয় নিহিত থাকে তাকে উপেক্ষা করলে জীবনের অনেক মাধুর্য বিলুপ্ত হয়ে যেত।

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতাকে একেবারে বাতিল করেও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সম্ভব নয়। ভাল গান শোনার পর, সূর্যাস্ত দেখার পর কিংবা ভালো বই পড়ার পর মনে যে একটা করুণ প্রশান্তি জাগে তার কারণও ঐ ইন্দ্রিয় সচেতনতা। কাজেই দুটো বিষয়ই একে অপরের সঙ্গে যুক্ত।

প্রাবন্ধিক শ্রীমতী আশালতা সিংহ লিখেছেন —

> ''রাসেল Mystic religious দের প্রতি যত শক্ত কথা বলুন, তাঁর রচনা পড়লেই বুঝতে পারা যায় রহস্যবাদের সুদূর স্নিগ্ধ ছায়া তার উপর এসে পড়েছে।''[৩১]

বৈজ্ঞানিক, গণিতবিদ্ যাঁদের মধ্যে আবেগহীন দৃষ্টি বিশেষভাবে বদ্ধমূল রয়েছে তাঁরা জীবনস্তর ভেদ করে নিবিড় অর্থ বুঝতে চান। তবুও একথাও সত্য যে, রহস্যের অস্তিত্বের অনুভব ছাড়া অনুসন্ধানের কাজে অগ্রসর হওয়া যায় না। আশালতা বলেন —

''ছায়া বিতানে কেহই প্রতীক্ষা করে নেই। তবু মানুষের মধ্যে কল্পনাপ্রিয়,
রহস্যপ্রিয় যে শিশু রয়েছে, সে কল্পনা করে বিমুগ্ধ হয়।''[৩২]

বাট্রান্ড রাসেল মানুষের দুঃখকে অনুভব করেন বলেই তাঁর লেখার মাঝে অনেক জায়গায় অনির্দেশ্য রহস্যের স্নিগ্ধ ছায়া প্রসারিত হতে দেখা যায়।

'শরৎচন্দ্র ও গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি'—

আশালতা সিংহের এই প্রবন্ধটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ১৬শ বর্ষ ১ম খণ্ড তৃতীয় সংখ্যায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা এবং গল্‌স্‌ওয়ার্দির লেখা যে সবিশেষ ভালো লাগে, সেই ভালো লাগার কারণ ভালো করে বলার মধ্যে যে একটা তৃপ্তি আছে তা প্রকাশ করতেই আশালতার এই প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রাবন্ধিক জানাচ্ছেন, শরৎচন্দ্রের সৌন্দর্যময় রচনায় আঙ্গিক বা ফর্ম তাঁর বিশেষ ভালো লাগে। বলার ধরনকে কীভাবে নিপুণতার সঙ্গে মধুর করে তোলা যায়। তা যেন শরৎচন্দ্রের নিজস্ব স্টাইল — এমন ভঙ্গি সচরাচর অন্য কারও রচনায় পাওয়া যায় না। শরৎচন্দ্রের লেখা বুঝতে কোনও অসুবিধাই হয় না এমনই প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি লেখেন আর তাই তার লেখা গল্প উপন্যাস সব ধরনের মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে। বাংলা সাহিত্যে এমন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক খুব বেশি নেই।

প্রাবন্ধিক আশালতা বলেন যে, শরৎচন্দ্রের ভাষা সরল হলেও ভাব যথেষ্ট গভীর। তাই শরৎচন্দ্রের লেখায় যে একটি অনায়াস জোর রয়েছে তাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করা যায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে যা লিখেছিলেন পঞ্চভূত গ্রন্থের প্রাঞ্জলতা শীর্ষক রচনায় তা থেকেই আশালতা উদ্ধৃত করেছেন — ''যাহা সরল তাহাই যে সহজ এমন কোন কথা নেই। অনেক সময় তাহাই অত্যন্ত কঠিন। কারণ সে নিজেকে বুঝাইবার জন্য কোন প্রকার বাজে উপায় অবলম্বন করে না, সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে; তাহাকে না বুঝিয়া চলিয়া গেলে সে কোনরূপ কৌশল করিয়া ফিরিয়া ডাকে না।''[৩৩]

কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মধ্যে যা সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে তা হল তাঁর নিবিড় মাধুর্য্য। প্রাবন্ধিক আশালতা ইংরেজ লেখক গল্‌স্‌ওয়ার্দির সাথে শরৎচন্দ্রের রচনারীতির স্নিগ্ধতা, সংবরণ, মূল সুরের সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছেন।

সেই কাজটা অত্যন্ত সুচারু রুপে নিঃশব্দে ঘটে থাকে ফলে তার মধ্যে সৌন্দর্যময় রূপটিই মনকে টানে। শরৎচন্দ্রের রচনার স্টাইল শুধু নয় তাঁর লেখায় ভেতরের গভীরতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ফলে ওপরের সৌন্দর্য ভেতরের চিন্তাশীলতা একযোগে কাজ করেছে।

গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দির 'ফরসাইথ সাগা'র সঙ্গে শরৎচন্দ্রের দেবদাস উপন্যাসের অনেকাংশে মিল রয়েছে। সেট দেখাতে আশালতা 'দেবদাস' এবং 'ফরসাইথ সাগা' দুটি উপন্যাস থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

আর্টের প্রধান বিষয় হল লেখক কীভাবে তাঁর লেখনী পাঠকের কাছে তুলে ধরছেন। কী বলছেন তা প্রধান নয়। শরৎচন্দ্রের লেখায় প্রকৃতির ছবি বিশদভাবে না থাকলেও চরিত্রসৃজনে, চরিত্রদের বেড়ে ওঠা, তাদের মানসিক বিপর্যয় প্রভৃতি দেখাতে তিনি মাঝে মাঝেই প্রকৃতির অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন যা পাঠককুলকে মুগ্ধ করে।

নীতি শিক্ষা দান সাহিত্যের কাজ না হলেও সাহিত্যের সমাজের প্রতিও দায়বদ্ধতা থাকে একথা অনেক সমালোচকই বলেন। এক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক আশালতার বক্তব্য — আহ্বায়ক

> '' ... হিতোপদেশ দ্বিতীয়ভাগ পড়ার চেয়ে তাঁর 'চরিত্রহীন' পড়লে অধিক নীতিশিক্ষা হয় কিন্তু সেটা একান্ত মাধুর্যের ভিতর দিয়ে সঙ্গোপনে এবং পুলকোচ্ছ্বাসের দ্বারা ঘটে এইটুকু মাত্র প্রভেদ।''[৩৪]

শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে যেমন গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দির ক্ষেত্রেও তেমনি একইকথা খাটে। তাঁরা উভয়েই তাদের লেখায় চরিত্রদের সৃষ্টি করেই নিজেকে একদম সরিয়ে নিয়ে সৃষ্ট চরিত্রদের প্রবৃত্তির কাছে নিঃশেষে নিজেকে দান করেছেন। ফলে চরিত্রদের প্রবৃত্তির কাছে নিঃশেষে নিজেকে দান করেছেন। ফলে চরিত্রগুলি সব নিজের পথে চলে পরিণতির দিকে, কোনভাবেই চরিত্রদের পথ করে দিতে হয়নি। সাহিত্যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন এবং সত্যান্বেষী রাখবার তাই প্রয়োজন রয়েছে। আশালতা এও বলেন যে, সাহিত্যের মাঝে নিজের জীবনের গভীর অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতার স্থান রয়েছে, কিন্তু সেটাই সব নয়, তাকে এমন করে প্রকাশ করা হয়েছে যে নিখিলের আনন্দ বেদনাকে সে উদ্বেল করে তুলেছে। বিষয়টা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অনুভবের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে; কিন্তু বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে যে আলোকবিকীর্ণ হচ্ছে সেখানে ব্যক্তির ছায়াপাত নেই, সকলের সৌন্দর্যোন্মুখ হৃদয়ক্ষেত্রে সে আন্দোলন তুলেছে।

তিনি মনে করেন যা জীবন দিয়ে অর্জন করা এবং অনুভবের দ্বারা পাওয়া তাই শুধু কাজে আসে। বাইরের বোঝা কেবল বিচ্ছিন্ন ভার। সাহিত্যের মধ্যে যা প্রকাশ পায়, তা বিশ্বের সামগ্রী হয়ে ওঠে। তাই প্রকাশের আন্তরিকতা এবং সত্যকে পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশের প্রয়াস সব থেকে বড় কথা।

শরৎচন্দ্র তাঁর নিজের লেখা গল্প-উপন্যাসে জীবনের বহুধা সমস্যাকে তুলে ধরেছেন কিন্তু কোনখানে জোর করে শেষ মীমাংসা করার বিন্দুমাত্র প্রয়াস দেখাননি। কোথাও সংবরণ করে থেমে যেতে হবে সে সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন। শরৎচন্দ্রের লেখার আরেকটা বৈশিষ্ট্য হল তিনি প্রথম চরিত্র সৃষ্টি করে তাদের ধীরে ধীরে পরিস্ফুট করতে বসে তাদের মাঝে আখ্যায়িকার আকার দেন। এ ব্যাপারেও

গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দির সঙ্গে তাঁর ভারি মিল রয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ 'চরিত্রহীন' এর কিরণময়ী চরিত্রটি সম্বন্ধে বলা যায়। কিরণময়ীর উপর কোনখানে প্রথম থেকে শরৎচন্দ্র একটা স্থির attitude এর ভার চাপিয়ে দেননি। কিরণময়ী নিজের কক্ষপথে অনবার্যভাবে ঘুরে চলেছে। তার কামনা-বাসনা-বেদনা-মনোবিকার, তার চারদিকের মানবমনে কীভাবে বিচ্ছুরিত হচ্ছে তারই পরিবর্তমান ইতিহাস পাঠক শ্রদ্ধা করবে কি অশ্রদ্ধা করবে কিংবা নীরবে প্রত্যক্ষ করবে — সেসব কোন কথাই আসছে না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে যেমন শেষ পর্যন্ত রোহিণীকে পিস্তলের গুলিতে মরতে হয়েছিল। সমাজের দাবি মত স্খলিত নারী তার উচিত শিক্ষা পেয়েছে কিন্তু সাহিত্য সৌন্দর্যের বিচারে রোহিণীর মৃত্যু কি উচিত হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গেল। কিরণময়ীর শেষ পরিণামও ভালো নয় কিন্তু তবু এই দুটি চরিত্রের attitudeএর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না।

'চরিত্রহীন' এর শেষের দিকে যখন সতীশ তাকে বর্ম্মা থেকে ফিরিয়ে নিতে এসেছে যেখানে ''দিবাকর অচেতন কিরণময়ীর দুই পদতলের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল আমি সমস্ত বুঝেছি বৌদি, তুমি আমার পূজনীয়, গুরুজন ...''[৩৫] এভাবে অপরিসীম স্নেহ-ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে এখানে কিরণময়ীকে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক।

অপর দিকে গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দির 'ফরসাইথ সাগা'র প্রেমের সংযত আবেগ সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে বসিনে এবং অইরিনের সকরুণ প্রণয় কহিনী এমনই সংবরণের মাধুর্যে পূর্ণ।

তাই প্রাবন্ধিক শ্রীমতী আশালতা সিংহ লিখছেন ''সৌন্দর্য ও প্রণয় সম্পর্কের ভিতর এই আশ্চর্য সংবরণ এবং স্নিগ্ধতা গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দির রচনায় পেয়েছি এবং তারই সঙ্গে শরৎচন্দ্রের রচনার একটি ঐক্যসূত্র খুঁজে পেয়েছিলেম্।''[৩৬] কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের লেখা গল্প উপন্যাসের নারীর প্রণয় কাহিনীর পেছনেও বৈরাগ্যের একটা ছায়া পরিলক্ষিত হয়। সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি অসংযম-উন্মত্ততার ভেতরেও ঐ বৈরাগ্যের দিকেই যেন তাঁর লেখনী নির্দেশ করতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' ঔপন্যাসের সুরেশ চরিত্রের মাঝেও এমনই একটি দিক লেখক নির্দেশ করেছেন তাই তো দেখা যায় — 'সুরেশ বলিল, হ্যাঁ আমারই ভুল, কিন্তু তবুও কথাটা সত্য। মন ছাড়া যে দেহ তার বোঝা যে এমন অসহ্যভারী, এ স্বপ্নেও ভাবিনি।''

একইভাব গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দিও তাঁর প্রায় কাহিনীতে Possessive insticnct এর অসৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন। তাঁর ফরসাইথ সাগার মূল ভিত্তিই তাই —

> ''Where the wild raiders, beauty and passion come stealing in filchering security beneath our noses. The impingement of beauty the clims of

freedom, on a pssessive world, are the main prepossesions of Forsyth Saga.''[৩৭]

'শ্রী বুদ্ধদেব বসু এবং বাস্তবতা'—

এই প্রবন্ধটি 'পুষ্পপাত্র' পত্রিকায় ১৩৪০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। শ্রী বুদ্ধদেব বসুর রচনারীতির ত্রুটি নিয়ে শ্রী দিলীপ কুমার রায় পুষ্পপাত্র পত্রিকায় 'বুদ্ধদেব বসু, বাস্তবতা প্রসঙ্গ তঃ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধ পাঠের পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রীমতী আশালতা সিংহ উক্ত প্রবন্ধটি লেখেন।

শ্রী দিলীপ কুমার রায় বুদ্ধদেব বসুর নারী নিন্দা নিয়ে আলোচনা করেছেন। দিলীপকুমার বলেছেন — পুরুষদের কখনোই নারীদের নিন্দা করা উচিত নয়। কারণ মেয়েদের মা হবার প্রয়োজনে, সন্তানের লালন-পালন, গৃহকাজের পরিচর্যা করতে করতেই তাদের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় তাই মেয়েরা শিল্প সৃষ্টি করার মত অবকাশই পায় না। প্রাবন্ধিক আশালতা বলেছেন —

> ''...স্ত্রীলোক আপন জীবনের উত্তাপ দিয়ে জীবন সৃষ্টি করে এসেচে — তার পক্ষে এই সৃষ্টিই চরম। বড় শিল্পী বড় কবি হতে পারাটা তার পক্ষে তাই অবান্তর।''[৩৮]

কিন্তু মেয়েরা বড় শিল্পী হতে না পারলেও তারা যে পুরুষ শিল্পীদের সৃষ্টিতে তিক্ততা ছড়িয়েছে তা তো নয়।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হওয়াতে কাজের অনেক সুবিধা হয়েছে। ফলে মেয়েদের হাতে অনেক সময় থাকছে কিন্তু সময় পেলেও মেয়েরা Potentially একজন মা। আর আশালতার কথায় —

> ''.... যে পোটেনশিয়ালি একজন মা সে যে আবার Potentially বড় একজন আর্টিষ্ট হবে প্রকৃতি এত বেশি আবদার বড় সয় না। সে বড় চতুর, ওজন বুঝ দাবী করে মনে বেশ জানে একজনের কাছেই দু'রকম দাবী করলে ভালো জিনিষটি পাবে না''[৩৯]

এই যুগটাই অস্থিরতার। অস্থির যুগের typical মনোবৃত্তিতে মানুষ কোন কিছুকেই গভীরভাবে নেবার অবকাশ পাচ্ছে না। সেকারণেই দেখা যায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শোনার চেয়ে রেডিও শোনা মানুষের কাছে অনেক বেশি গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। যাতে তাড়াতাড়ি উত্তেজনা আসে এমন জিনিষই বরাবর মানুষকে আকর্ষণ করেছে।

শ্রীবুদ্ধদেব বসুর লেখা উপন্যাসে যেসব ঘটনা দেখা যায় তা কেবল কোলকাতা কেন্দ্রিক বলে অনেকেরই মনে হতে পারে কিন্তু আজ যা কোলকাতায় দেখা যাচ্ছে তা সে ভবিষ্যতে বাংলার অন্যান্য

অঞ্চলে দেখা দেবে না এমন তো কোন কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

নির্ভীক, তেজস্বী ভাষায় শ্রী বুদ্ধদেব বসু তাঁর লেখায় যুগের যন্ত্রণাকে তুলে ধরেছেন। বুদ্ধদেব বসুর লেখা 'এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে' বইটি আশালতার মতে সবচেয়ে ভালো কারণ এতে বুদ্ধদেবের লেখার ষ্টাইল চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে দৈহিক প্রেমের যে বর্ণনা আছে তাতে অনেকে অশ্লীলতা লক্ষ্য করেছেন; এ বিষয়ে প্রাবন্ধিক আশালতার মত হল — দৈহিক প্রেমের বর্ণনা জিনিষটা in itself অশ্লীল নয়, কারণ তাহলে জগতের নানা শ্রেষ্ঠ কাব্য সাহিত্যে একে বরদাস্ত করা হত না।

শ্রেষ্ঠ শিল্পীর লেখায় দৈহিক প্রেমের বর্ণনা যদি প্রেমের গল্পের সঙ্গে সমঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে বইটার মাধুর্য অনেক বেড়ে যায়।

প্রাবন্ধিক আশালতার মতে শ্রীবুদ্ধদেব বসু ভারতবর্ষীয় সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে যুগের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন। তাঁর উপন্যাসে কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি এবং রুচিগত স্থূলতার দিকটা বাদ দিলে দেখা যায় যে তাঁর কিছু কিছু উপন্যাসের নায়িকারা যেভাবে প্রেম করছে, স্বাধীনভাবে চলাফেরার যে সুবিধা তারা পাচ্ছে তখনকার দিনে এদেশে তো দূর বিদেশের বাস্তব ভূমিতেও ইউরোপীয়ান মেয়েরাও ততোটা সুযোগ সুবিধা পেত না।

'গোরা আর কুমুদিনী' —

এই প্রবন্ধটি জয়শ্রী পত্রিকায় ১৩৪০ শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রাবন্ধিক আশালতা এই প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গোরা এবং যোগাযোগ উপন্যাসের কুমুদিনী চরিত্র দুটির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। গোরা পুরুষ চরিত্র হলেও কুমুদিনীর সঙ্গে তার চরিত্রের একটি অসামান্য মিল খুঁজে পেয়েছেন আশালতা। মনের ভেতরের বক্তব্য উভয়ের একই।

পুরুষের জীবনের সাধনা সৃষ্টি করে চলা। তাই গোরা তাঁর সাধনা দিয়ে তাঁর প্রাণের ভারতবর্ষকে দুঃসহ হোমানলে নতুন করে সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর হন। ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে যে জাত-পাতের কুসংস্কার রয়েছে সেসবের নিন্দাও গোরা এতটুকু সহ্য করবে না, তার কাছে তাই ভারতবর্ষের কুসংস্কারকে কোনরকমভাবে সামান্য কটাক্ষ করাও অত্যন্ত অপ্রীতিকর।

অথচ গোরার পাশে গোরারই বন্ধু বিনয়, সে কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিক, তাঁর শান্ত বিনম্র সাবলীলতা তাঁকে পাঠকের অনেক কাছের মানুষ করে তোলে।

গোরার নিজের জীবনকে এবং ভারতবর্ষকে নিয়ে প্রতিনিয়ত সতর্ক হয়ে চলার যে সমস্যা তা সবথেকে বেশি ধাক্কা খেয়েছে যখন গোরা বিনয়ের সংস্পর্শে এসেছে। বিনয়ের কাছে দেশের চেয়ে মানুষ সত্য কারণ বিনয় স্বাভাবিক দয়ার্দ্রপূর্ণ মানুষ। কিন্তু গোরা খাকিটা জবরদস্ত গোছের লোক। সে

তাঁর ভাবের ভারতবর্ষকে সকলের ওপরে স্থান দেয়। গোরা মাঝে মাঝে ভারতের গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করে বেড়ায়, কিন্তু পল্লীগ্রামের সকল মানুষের আতিথ্য গ্রহণে সে অপারগ কারণ তার ব্রাহ্মণের শুচিতা, তাঁর আচার বিচার তাঁকে সমস্ত লোকের থেকে আলাদা সারিতে দাঁড় করায়।

গোরার সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় সুচরিতা। গোরা যতই মুখে বলুক হিন্দু শাস্ত্রে আছে তাই মেয়েদের বিয়ে হওয়া চাই-ই কিন্তু যখন ভাবে অন্য কারো সঙ্গে সুচরিতার বিয়ে হবে তখন সে সেটা কিছুতেই মানতে পারে না।তাই যতই জোরের সঙ্গে গোরা সুচরিতার মাসির হাতে বিধান লিখে দিক ''গোরার হৃদয় এ কল্পনা কর্ত্তেও নারাজ।''[৪০] গোরার মুক্তি এল তখন যখন সে নিজের জন্ম রহস্য জানতে পারল। সে মুক্তি আসে প্রচণ্ড আঘাতের অবশ্যম্ভাবী পরিণামরূপে, অগ্নিগিরির অগ্নি উচ্ছ্বাসের মত তখন গোরার মুখ দিয়া বাহির হইল — ''মা, তুমি আমার মা নও?''[৪১] এরপর অবশ্য গোরার মুক্তি এল। সে দিন রাত্রি যা হতে চেয়েছিল অথচ হতে পারছিল না আজ সে তাই হয়েছে। সে হয়েছে আজ প্রকৃত ভারতবর্ষীয়। যে ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমান-শিখ-জৈন সকল মানুষের সকল ভারতবাসীর সকলের সঙ্গেই সে আজ একাসনে বসতে পারে।

গোরার জীবনে যে সমস্যা পুরুষের, কুমুদিনীর পক্ষে সেই সমস্যা নারীর। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যোগাযোগ উপন্যাসের কুমুদিনী এবং তাঁর স্বামী মধুসূধনের মধ্যে দেহে মনে আত্মায় কোন মিলই নেই, দুজনে যেন ভিন্ন জগতের দুই বাসিন্দা, ওদের ভেতরের বাধাটা তাই সূর্যের মত সত্য। কুমুদিনীর দাদা বিপ্রদাস এই সত্যটা বুঝতে পেরেছিল। কুমুদিনি কিন্তু এ সত্যকে দাদার কাছে লুকোতে চাইল। স্বামী মধুসূদনকে কুমুদিনী যতই তার হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করতে বাধা পাচ্ছে ততই সে তার দেবতাকে স্মরণ করছে, ''... দেবতাকে দিয়ে সে তার স্বামীকে আবৃত কর্ত্তে চায়।''[৪২]

কুমুদিনী তাই নিজের জীবনের সমস্ত শূন্যতা, সমস্ত অপমান, শূন্যতা গ্লানিকে ... একটা বড়া উগ্র ভাবের কড়া মদ পান করে ডুবিয়ে দিতে চাইলে, ও কেবলই বাইরের থেকে যত আঘাত পায়, মনে মনে ভাবের রাজত্বে ততই মুখ গুঁজে পড়ে। ''.... সারাবেলা বসে বসে আবৃত্ত করে, মেরে গিরিধর গোপাল, ওর নাহি কোহি।''[৪৩]

কুমুদিনী প্রথম রাতের স্বামী সংসর্গের পরে মনে মনে ভাবে যে, যে আহ্বানকে সে দৈব বলে মেনে নেবে ভেবেছিল সে কি এই অশুচিতার মধ্যে, মন নেই, আত্মার সায় নেই সেই শরীরী মিলনে কি সৌন্দর্য আছে।

কুমুদিনীর এই সমস্যাকে প্রাবন্ধিক আশালতা সিংহ মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন গলসওয়ার্দ্দির্ব 'ফবসাইথ সাগার আইরিন চরিত্রটির সঙ্গে আইবিন ও তার স্বামীর সংস্পর্শে আন্তরিকভাবে এড়াতে চেয়েছন গলসওয়ার্দ্দি যার জন্য লেখেন —

> "Where sex attraction is utterly and definitely lacking in one partner to a union no amount of pity, or reason, or duty or what not, can overcome a repulsion implict in nature."[৪৪]

গলসওয়ার্দ্দি যেখানে যেমন করে শেষ করেছেন উপনিষদের ভাবরসে লালিত রবীন্দ্রনাথ তা করনেন না, মহাকবি কালিদাস যেমন অপমানিত শকুন্তলাকে শেষে পৌঁছে দিয়েছিলেন তপস্যা পরায়ণ স্তব্ধ সুনিবিড় সার্থকতায় রবীন্দ্রনাথও তেমনি কুমুদিনীকে পৌঁছে দিলেন মুক্তির অনাস্বাদিত পূর্ণতায়। 'যেখানে সমস্ত সমস্যার ধারা এসে মিলেছে একটি সুবৃহৎ, অচঞ্চল ঐক্যে।

আর এখানেই গোরা এবং কুমুদিনীর মুক্তি এক রেখায় মিলে যায়।

'পথের পাঁচালী ও অপরাজিত' —

প্রবন্ধটি ১৩৪০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে জয়শ্রী পত্রিকায় বের হয়েছিল। প্রাবন্ধিক শ্রীমতী আশালতা সিংহ জানাচ্ছেন যে, সাহিত্য ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' যখন প্রকাশিত হয় তখন সকল পাঠকই স্বীকার করেন যে এর আগে তারা এত সুন্দর সৃষ্টি দেখেননি। আশালতার মতে — "এ যেন বহু পুরাতন বহু পরিচিত বস্তুকেও স্বকীয় প্রতিভার আলোতে একেবারে নতুন করে দেখানো।"[৪৫] 'পথের পাঁচালী'র আরেকটা বিশেষত্ব হল ছোট ছেলেমেয়েরাও এই বইটিকে অত্যন্ত ভালোবাসে। 'অনন্তের অভিসার চিরপথিক মন এর চিরয়ামান পথ যাত্রার বার্ত্তায় অবারিত মুক্তির স্বাদ খুঁজে পেলে।'[৪৬]

বাংলা সাহিত্যের সমালোচকেরাও এক বাক্যে এই 'পথের পাঁচালীকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে অভিহিত করেছেন। আশালতা লিখেছেন —

> "পথের পাঁচালী এবং অপরাজিত'র মধ্যে যে একটা অসীমতার আভাস রয়েছে সেটাই সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য। 'পথের পাঁচালী উপন্যাসে কাহিনীকে অতিক্রম করেই জীবনের ভালো-মন্দ, আশা-নিরাশা, সমস্তকে স্থির বিশাল পটভূমিতে রেখে দেখার যে প্রবৃত্তি মানুষের তা সব সময়েই অনুভবগম্য।"[৪৭]

'পথের পাঁচালী' অপরাজিত'র নায়ক অপুর কামনা বাসনা কখনোই ছোট-জিনিসের উপর নিবদ্ধ থাকে না; শিশু বয়স থেকেই তার মনে স্বপ্নের আবেশ। তাঁর কল্পনা, কৌতুহলপ্রিয়তা আশমানকে ছুঁতে চায়। এরই সঙ্গে অপুদের গ্রাম নিশ্চিন্দিপুর (নিশ্চিন্তপুর) অপুর চরিত্রকে বিকশিত করতে তার চরিত্রের মধ্যে যে সদা অতৃপ্তি, তার যে মনের ক্ষুধা গোটা বিশ্বকে গ্রাস করতে চায় সেই মনকে আরও পরিণত

করতে অপুর ছেলেবেলায় তার গ্রাম নিশ্চিন্তপুরকে না রাখলেই চলত না। এমনকি তার অসময়েও অপূর্ব সৌন্দর্যের প্রতি তার যে দুর্ব্বার আকর্ষণ তাকে কিছুতেই তলিয়ে যেতে দেয়নি।

অপূর্বর নিজের জীবনের এই সৌভাগ্যকে সে তার ছেলে কাজলের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল তাই তো অপু বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে কাজলকে নিশ্চিন্দিপুরের লীলাদির কাছে রেখে গিয়েছিল। অপু চেয়েছিল তাঁর ছেলে কাজলও অপুর মত প্রকৃতির নিবিড় সৌন্দর্য উপভোগ করতে শিখবে যার সূত্রপাত হবে নিশ্চিন্তিপুরের গ্রাম্য প্রকৃতির শোভা দু'চোখ ভরে উপভোগের মধ্য দিয়ে। কারণ —

> ''স্কুলের সীমাবদ্ধ পাঠ্যপুস্তকে তাড়াতাড়ি ছেলের মনকে নিয়োজিত করে তকে ঝকঝকে য়ুনিভাসিটির ভালো ছেলে করার চেয়ে নানা উপকথা, নানা পুরাণ কাহিনী কিংবদন্তীতে মনকে অন্তত কিছুকালের জন্যও ছাড়া দেওয়া ভালো।''[৪৮]

তাই কাজলকে লীলাদির কাছে রাখবার সময় অপু বলে যে কাজল একটু ভীতু গোছের তবুও তাকে খুব স্পষ্ট করে সব কিছু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই; কাজলের মন যা মানতে চায় তা মানতে ওকে যেন বাঁধা দেওয়া না হয়।

মডার্ন সভ্যতায় মানুষের মনের যে সব অপরিপূর্ণতা তার অন্যতম কারণ মানুষ শৈশব থেকেই নানান যান্ত্রিকতায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে, রূপকথার জগৎ, পুরানের গল্প তার ছেলেবেলায় কেউ তাকে বলেনা।

অপুর ছেলেবেলায় তার মানসিক বিকাশের সময় প্রধান সঙ্গী ছিল তাঁর দিদি দুর্গা, মা সর্ব্বজয়া এবং কখনো কখনো তাঁর বাবা হরিহরও। অপূর্ব্ব-র সঙ্গে তারবাবা-মা-দিদি কখনো সাংসারিক বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন কড়া অভিভাবকের মতো ব্যবহার করতেন না। সাধারণ পল্লীগ্রমের অশিক্ষিতা, কলহপ্রিয়া অতি সাধারণ সর্বজয়ার সৌরজগতের সূর্য তার ছেলে অপু; মেয়ে দুর্গার পানে চেয়ে দেখার অবসরও সর্বজয়া পেতেন না, তার যা কিছু সবই যেন অপুর জন্য। পল্লীগ্রামের এটাও কুরীতি - যে মেয়ের চেয়ে ছেলে অনেক বেশি আদর যত্নে মানুষ হয়।

'পথের পাঁচালী'তে দেখি দুর্গার সঞ্চয়ের দিকে আগ্রহ, কিন্তু অপুর সঞ্চয় নয় নব নব সম্ভাবনার দিকে তার অপরিসীম আগ্রহ।

প্রাবন্ধিক আশালতার মনে হয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবর যেন অপুর জীবনে একটা অনাসক্ত ভাব দেখাতে চেয়েছেন। তাই সে কোন স্নেহ প্রেমের বন্ধনে আটকা থাকতেপারে না। অপূর্ব্বর যৌবনকালের পরিপূর্ণরূপ লেখক বিভূতিভূষণ ফোটাতে পারেননি। আশালতার কথায় — ''যুবক

অপূর্ব্ব কোনদিন কোন মানবীর প্রেমের স্মৃতিতে তেমন করে আর্ত্ত হয়ে ওঠেনি যেমন করে সে নানা দেশে নানা পথে-প্রবাসে ঘুরতে ঘুরতে অধীর হয়ে উঠেছিল তার শৈশবের লীলাক্ষেত্র নিশ্চিন্তিপুরের পল্লী প্রকৃতির জন্য।''[৪৯]

স্ত্রী অপর্ণার চলে যাবর আগে এবং পরে কত নারীর সংস্পর্শে এসেছে অপু — লীলা, রাণুদিন, নির্ম্মলা, অমলা — কিন্তু সকলের সঙ্গেই তার স্নেহ, মমতা, করুণার সম্পর্ক।

অপূর্ব্ব কোনদিনই কোন স্নেহ প্রেমের বন্ধনে আটকা পড়ে থাকতে পারে না। তাই বিভূতিভষণের অপূর্ব্বর মনোজগতের বিপ্লবের কাহিনী তার মনের গভীরে প্রেয়সী নারীর প্রতি যে ক্রমবর্ধমান মনের গতি সেটা কেমন যেন পাঠকের কাছে অধরাই থেকে যায়। তাই 'অপরাজিত' কে অসম্পূর্ণ মনে হয়।

'সাহিত্যের ধারা' —

প্রবন্ধটি জয়শ্রী পত্রিকায় ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটির প্রথম অংশে প্রাবন্ধিক শ্রীমতী আশালতা সিংহ 'স্টাইল ও বিষয়বস্তু' নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সাহিত্যে একটা পরিবর্তন এসেছে, সেই সঙ্গে একটা প্রশ্নও উঠে এসেছে তাহল — সাহিত্যে বিষয় বস্তু বড় না কি প্রকাশভঙ্গী বড় — এ সম্বন্ধে প্রাবন্ধিক তাঁর মতামত দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির উল্লেখ করে জানাচ্ছেন যে চিঠিটিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন — ''... রাঁধুনীর হাতের যাদুটাই আসল''[৫০] অর্থাৎ যিনি প্রকাশ করতে জানেন তিনি সামান্য বস্তুকেও অসামান্য রূপে প্রকাশ করেন, তবে এও সত্যি যে যাঁরাই সাহিত্য কর্মে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তাদের রচনার বিষয়বস্তু এমন কিছু আশ্রয় করে থাকে যা মোটেই সামান্য নয়। যা দেশ-কাল-জাতির প্রাণের বস্তুতে পরিণত হয়।

স্টাইল হচ্ছে একটা ভঙ্গী, প্রকাশ করবার একটা সৌন্দর্যময় রূপ, সাহিত্যিকদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্টাইল আছে। যা ছিল অ্যাবস্ট্রাকট্ আইডিয়া তাদেরকেই চারপাশের অপরিচিত মানব-মানবীর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার মধ্যে বিরাজ করতে দেখলে তাদের নিজের বলে পাঠক দর্শকদের মনে হয়। অরূপকে এভাবে যে রূপের বাঁধনে বেঁধে দেওয়া — এটাই সকল সাহিত্যিকরা নিজের মনে ধাচে নিজের স্টাইলে করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক আশালতা রবীন্দ্রনাথের উক্তি তুলে ধরেছেন —

''সাহিত্য বিষয়টা শ্রেষ্ঠ না ভঙ্গীটা শ্রেষ্ঠ ইহা বিচার করিতে হইলে আমি দেখি কোন্‌টা

অধিক রহস্যময়। বিষয়টা দেহ ভঙ্গীটা জীবন। দেহটা বর্তমানেই সমাপ্ত, জীবনটা একটা চঞ্চল, অসমাপ্তি তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে, তাহাকে বৃহৎ ভবিষ্যতের দিকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, সে যতখানি দৃশ্যমান তাহা অতিক্রম করিয়াও তাহার সহিত অনেকখানি অশাপূর্ণ নব নব সম্ভাবনা জুড়িয়া রহিয়াছে। সাহিত্যকারের স্টাইল তাহার সেই গতিভঙ্গী।''[৫১]

গল্প দুচার কথায় শেষ হয়ে যায় কিন্তু তার রস পাঠককুলকে চিরকাল আনন্দ দান করে। এ প্রবন্ধের শেষে প্রাবন্ধিক বলেছেন — দেহ এবং জীবন যেমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে একে অপরের সঙ্গে জড়িত, কে বড় কে ছোট এ তর্ক বৃথা তেমনি বিষয়বস্তু এবং স্টাইল সম্বন্ধেও এ কথাটি প্রয়োজ্য। সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে থাকবে অসীম স্নেহ এবং প্রকাশের মধ্যে থাকবে আন্তরিক আবেন। এই আবেগ এই সত্য নিষ্ঠাই তার ভাষাকে দেবে রূপ এবং তার বক্তব্যকে করবে সংযত ও মধুর। চিন্তাবিদ অল্ডাস হাক্সলিও এ সম্বন্ধে এমনই মত দিয়েছেন।

'সাহিত্যের ধারা'র দ্বিতীয় অংশ আর্ট ফর আর্টস সেক্ প্রবন্ধ। প্রাবন্ধিক আশালতা সিংহ জানাচ্ছেন সাহিত্যের উদ্দেশ্য কেবল আনন্দ দেওয়া। সাহিত্যের যা কিছু উদ্দেশ্য তা সে কেবল আনন্দের মধ্য দিয়েই সম্পন্ন করে। আর তাই কোন জাতির অসল সম্পদ হল তার সাহিত্য। কিন্তু সাহিত্য আনন্দ ছাড়া আর কিছুই কি দেয় না? তার উত্তর দেওয়া কঠিন; তবে এটুকু বলা যায় যে, সাহিত্য যা দেয় তা নিজের নিয়েমই দেয়, সাহিত্য সাংসারিক, সামাজিক চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে। সাহিত্যে আর্ট ফর আর্টস সেক সম্বন্ধে বলা যায়, প্রকাশ করতে পারা কেবল এরই একটা অনিবার্য আকর্ষণ রয়েছে।

সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারা যথেষ্ট আনন্দ এবং উত্তেজনা দান করলেও আর্টের মাঝে রয়েছে এর চেয়েও বড় আনন্দ এবং গৌরব। কারণ জীবনের মধ্যে সকল সৌন্দর্যকে গ্রহণ করার মধ্যেই রয়েছে সার্থকতা আর তাই আর্টকে যারা সমস্ত ধর্মাধর্ম পাপপুণ্যের অতীত আনন্দের একটি বিকশিত শতদলের মতো জীবনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারেন তারাই দিন শেষে প্রিয়তমের হাতে দুর্লভ আনন্দ সঞ্চয়গুলি তুলে দিয়ে ধন্য হন।

'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক শ্রীমতী আশালতা সিংহ লিখলেন — যে উপন্যাস চিন্তাশক্তি বাড়ায় না, বিশ্বের দরবারে আমাদের মনের দ্বার উন্মুক্ত করে না, যে উপন্যাস আত্মার আলোয় আলোকিত হয় না সে উপন্যাসকে প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস বলা যায় না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি উপন্যাসে গল্পের ফাঁকে এমন চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়েছে যা মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়।

এই প্রসঙ্গে আশালতা রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের সঙ্গে এইচ.জি.ওয়েলফেয়ার, ওয়ার্ল্ড

অফ উইলিয়াম ক্রিসোল্ড' উপন্যাসের তুলনা করে দেখান যে,

> ''...শক্তির অভাবে ওয়েলসের বইখানা রাজ্যের খবর, সমস্যা এবং চিন্তার একখানা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের গোরায় আর্টিস্টের সেই শক্তি পুরোপুরি থাকায় রস সাহিত্যে গোরার স্থান অনেক উপরে।''[৫২]

'শ্রীকান্ত-চতুর্থ পর্ব' —

প্রবন্ধটি উত্তরা পত্রিকায় ১৩৪০ এর ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

' শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব' সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে প্রাবন্ধিক আশালতা সিংহ জানাচ্ছেন —

> ''শরৎচন্দ্রের প্রথম দুইখন্ড শ্রীকান্ত আমরা রাজলক্ষ্মীকে যেমন করিয়া দেখিয়াছি তাহার জুলনা নাই। তৃতীয় খন্ডে তাহার সৌন্দর্য ম্লান এবং চতুর্থ পর্ব্বে অস্তিমিত।''[৫৩]

শ্রীকান্ত উপন্যাসের চতুর্থ পর্ব্বে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর যৌথ জীবন তাদের অন্তর বাহিরের দ্বন্দ্ব যে খাতে বইতে দেখবে ভেবে পাঠক আশা করেছিল তা অনেকটাই হয়নি। বরং শ্রীকান্তের তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত যে সুমধুর দৃশ্য পাঠকের কল্পনার মাঝে আশ্রয় পেয়ে স্বপ্নময় জাল বুনতে পাঠককে সাহায্য করেছিল চতুর্থপর্বে সেই স্বপ্ন যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্ব-পর্যন্ত দেখা যায় শ্রীকান্তের যথেষ্ট মনঃকষ্ট সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র কখনো প্রেমের জন্য সম্ভ্রমকে ছোট করতে পারননি। কারণ সাংসারিক দৃষ্টিতে প্রেমস্পদের যদি অসম্মান হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে প্রেমকে অন্তরের মধ্যে রেখে বাইরে সেই প্রেমকে অবদমিত করাই বিধেয়। তাতেই প্রেমাস্পদের মান মর্যাদ রক্ষা হয়।

'শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব্ব'-এ দেখা গেল যে রজলক্ষ্মী যপতপ নিয়ে রীতিমত সন্ন্যাসিনীর জীবন কাটাবে বলে মনস্থির করেছিল সেই যখন শুনল শ্রীকন্ত পটু নামের একটি বালিকাকে বিয়ে করতে চলেছে তখন সে আসন্ন সতীন ভয়ে কন্টকিত হয়ে রীতিমত টাকা পয়সা দিয়ে বিষয়টিকে বন্ধ করতে তৎপর হয়ে ওঠে। এছাড়াও রাজক্ষ্মীর মুখের ভাষাও অত্যন্ত অশালীন লেগেছে বিশেষ করে তার মুখে 'মাগী' শব্দটি উচ্চারণে। শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব্বে যে বস্তুটি অতুলনীয় তা হল রাজলক্ষ্মী ও কমললতার প্রতি শ্রীকান্তের ভালোবাসার দ্বিবিধ রূপ। সাংসারিক মায়ার বন্ধন শ্রীকান্তকে কোনদিন বাঁধতে পারেনি। রাজলক্ষ্মীর

চেয়ে কমললতা রূপে গুণে অনে খাটো হলেওরাজলক্ষ্মীর প্রেমে স্বাতন্ত্র্যের অভাব ছিল যা কমললতার মধ্যে ছিল না আর তাই কমললতার কাছে শ্রীকান্ত যে তৃপ্তি মাধুর্য পেয়েছিল তা রজালক্ষ্মীর কাছে পয়নি, অন্তত শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব্বে সেটাই পরিলক্ষিত হয়।

বস্তুত, রাজলক্ষ্মীর প্রেম শ্রীকান্তকে কেন্দ্র করে হলেও প্রেমাস্পদ শ্রীকান্তের জন্য সে সর্বস্ব ত্যাগ করেনি, রাজলক্ষ্মীর ত্যাগ তার নিজের জন্যও; কিন্তু কমললতা তা নয়। কমললতার মধ্যে যে নির্লিপ্ত বিচ্ছিন্নতার সুর যে শুধু প্রেমাস্পদকে দিতে পারলেই সুখী এমন আত্মবিলোপী প্রেম চির পথিক শ্রীকান্তকে একান্তভাবে বিমোহিত করে।

শ্রীকান্তের চরিত্রের মধ্যে আগের পর্বগুলির মতো সঙ্গতি, সামঞ্জস্য এবং মননশীলতার অভাব রয়েছে। শ্রীকান্ত কোনদিনই সামাজিক পাপ পুণ্যের বাটখারা দিয়ে মানুষকে বিচার করেনি, কিন্তু যখনই সে অভয়া, রোহিনী, রাজলক্ষ্মীর সংস্রবে এসেছে তখনই তার মধ্যে হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে সামাজিক বোধ-বুদ্ধির দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে। অমর কথা শিল্পী শরৎচন্দ্রেরও শ্রীকান্ত আগের পর্ব্ব গুলির লেখায় যে ধরণ ছিল — যে লেখায় প্রক্যেকটি কথা প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি কথা ইঙ্গিতময়, প্রত্যেকটি চরিত্র সজীব এবং স্পন্দিতরূপে চোখের সামনে উঠে এসেছিল তা অনেকখানি যেন ব্যহত হয়েছে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চতুর্থ পর্ব্বে।

'বাংলা আধুনিক লেখক' —

প্রবন্ধটি ১৩৪১ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ্য সংখ্যায় জয়শ্রী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে আশালতা জানাচ্ছেন বর্তমান সময়ের বাংলার লেখকবর্গ সাহিত্যে 'কল্পনার স্যানিটি' থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। প্রাবন্ধিক স্বয়ং এ মতে বিশ্বাসী নয় এ প্রসঙ্গে আশালতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছেন।

শক্তিধর লেখকেরা জীবনকে দেখেন অত্যন্ত সহানুভূতি ও মাধুর্যের সাথে; ফলে তাঁরা তাদের লেখাতেও সেই মাধুর্যের রস ছড়িয়ে দেন। জীবন যেমন হওয়া সম্ভব তা ফুটিয়ে তুলতেই লেখক জীবনের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা সত্যকে সকল মানুষের সামনে একীভূত করে দেখবার জন্য প্রত্যহ ঘটা ঘটনাকে কিছু বাড়িয়ে বা কমিয়ে উপস্থিত করেন। এতে সত্যের অপলাপ হয় না।

'রবীন্দ্রনাথের আধুনিক লেখা' — প্রবন্ধটি জয়শ্রী পত্রিকায় ১৩৪১ এর আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে আশালতা বলছেন — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধুনিক লেখার যে কোন পাতা খুললেই

দেখা যাবে যে - ভাষাকে সর্বধরণের কৃত্রিমতা থেকে মুক্তি দিয়ে কীভাবে সমস্ত অনাবশ্যক বস্তু পরিহার করে তাকে কত দ্রুতগামী আন্তরিকভাবে সমৃদ্ধ করে প্রকাশ করা যায়। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লেখার ধরণকে পরিবর্তন করেছেন। এখন থেকে চলিত ভাষাতেই তিনি লিখতে আরম্ভ করেন।

রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের লেখাগুলিও বেশ ছোট আকারের। যেমন — শেষের কবিতা, 'বাঁশরী' নাটক প্রভৃতিও বড় আকারের নয়; 'পুনশ্চ' কাব্যখানি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। এসব কাব্য নাটক উপন্যাসে তিনি যেমন সংক্ষিপ্ত রচনারীতি প্রয়োগ করেছেন তেমনি এরই মধ্যে বিশ্বের অসীমতাকে নিহিত করেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংযত এবং নিঃশব্দবাক্ রচনার রূপ প্রত্যক্ষ করে পাঠকেরা বিমোহিত হলেন। কবিগুরুর উপন্যাসের মধ্যে কোন উপন্যাসের অন্তর্গত পাত্র-পাত্রীদের জীবনের সুখ-দুঃখ আলোড়ন ছাড়াও ফুটে উঠেছে একটা বিশ্বজনীন সুর।

রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী প্রতিভা সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যেই বিশ্ববীণার সুর এনে ফেলেছে যে সুরের গাম্ভীর্য, সংযম, স্বল্পবাক্যতা সবই অভূতপূর্ব সৌন্দর্যময়। এছাড়া নিজের সমালোচনাও যেভাবে কবিগুরু নিজের লেখনীর মাধ্যমে করেছে তাও আমাদের বিস্ময় জাগায় — 'শেষের কবিতা' থেকে —

''বন্যা, ওটা তোমাদের রবি ঠাকুরের কথা। সে লিখেচে, সাজাহান আজ তার তাজমহলকেও ছাড়িয়ে গেলো। একটা কথা তোমার কবির মাথায় আসেনি যে আমরা তৈরি করি, তৈরি জিনিষকে ছাড়িয়ে যাবার জন্যেই।''[৫৪]

এমন প্রতিভাধর কবির প্রতি শ্রদ্ধায় তাই প্রাবন্ধিক আশালতা সহ আমাদের সকলেরই মস্তক বারে বারে নত হয়ে আসে।

'অনামী' —

আশালতা সিংহের লেখা অনামী প্রবন্ধটি ১৩৪১ বঙ্গাব্দে উত্তরা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র শ্রী দীলিপ রায় 'অনামী' নামে একটি কবিতা গ্রন্থ লেখেন। অনামী কবিতাগ্রন্থের কবিতাগুলির বিশ্লেষণ করেছেন প্রবন্ধিক আশালতা সিংহ তার লেখা 'অনামী' প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে। কবিতার জগতে এক নতুন স্পন্দন নতুন প্রাণ চঞ্চলতার সঞ্চার করেছে দীলিপ কুমার রায়ের অনামী কবিতা গ্রন্থটি। রসিক পাঠক মহলে এ বই যে যথেষ্ট সমাদর পাবে সে সম্বন্ধে প্রাবন্ধিক আশালতার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে তবে এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক এটাও জানাতে ভোলেননি যে সাধারণ

পাঠক হয়তো এ কবিতাগুলির রস উদ্ধার করতে নাও পারেন।

কবিতাগুলির রস মাধুর্য, ভাবগভীরতা এবং অভিনবত্ব সমঝদার পাঠকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলেই মনে করেছেন আশালতা।

'শিশিরের মর্মবাণী' — ১৩৬২ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যায় মাসিক বসুমতী পত্রিকায় আশালতা সিংহের এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রাবন্ধিক বলছেন — ''জগতে চরম ত্যাগ হোল পরম পাওয়ার মূল্যে, সিদ্ধির আগে চাই সাধনা, চাই অবিচল নিষ্ঠা।''[৫৫] তাই বসন্ত ঋতুর জন্যও শীত ঋতু নীরবে, ঐকান্তিকভাবে তপস্যা করে। এই সময়ে শীত এর মধ্যে দেখা যায় 'বিরহ মধুর ম্লান সৌন্দর্য। বসন্তের জন্যে বসন্তের ধ্যানে শীতের বিরহিনী প্রতিটি মুহূর্ত বিন্দু বিন্দু শিশিররাশ্রু ফেলে বিনিদ্র প্রতীক্ষায় কাটে। প্রভাত সন্ধ্যায় আকাশ-বাতাস ভরে থাকে কুয়াশায়, দেখে মনে হয় ধূপের সৌরভে চারিদিক সুরভিত, কেউ যেন তপস্যা করে চলেছে। শীতের এই ব্রত একদিন সার্থক হবেই আর তখন পুষ্প পাত্রে সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে হাজির হবে ঋতুরাজ বসন্ত।

প্রকৃতিও শীতের এই তপস্যায় সামিল হয়। প্রিয়স্পর্শে একদিন সে মুকুলিত পুষ্পিত শ্যামল শোভায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে জন্যই আজ সে রিক্ত, নীরবে তপস্যায় মগ্ন। প্রকৃতির এই নিয়ম মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে চির বৈরাগী তাপস, বিলাস ব্যাসনে কাটালেও কোন এক সময় সে সমস্ত কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে বৈরাগ্য অনুভব করে সেই সঙ্গে ভূমার প্রতি তার যে টান সেটাও মানুষ উপলব্ধি করে। সেই সঙ্গে এও বোঝে যে সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিও তপোমগ্না।

যে পাওয়ার পেছনে ত্যাগ থাকে না, থাকে না দুঃখ বরণের মহিমা —

> ''তা অসম্পূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন অশালতা তাঁর এই প্রবন্ধে। শীত ঋতু ব্রতচারিণী উমার মতো শান্ত সহিষ্ণুতার সঙ্গে বসন্তের জন্য তপস্যা করে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে। দয়িত রূপ বসন্ত এসে নিরাভরনা দয়িতা শীতের সব দৈন্য ঢেকে দেবে তাই 'বসন্তের জন্যে তপস্যাই হোল শীতের মর্মবাণী।''[৫৬]

'সতীনাথ ভাদুড়ী' —

প্রবন্ধটি অমৃত পত্রিকায় ১৩৭৬এর বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ীর অনন্য সাধারণ সাহিত্যকর্মের জন্য আশালতা সিংহ তাঁকে ইংরেজ কথা সাহিত্যিক ডিকেন্সের সঙ্গে

তুলনা করেছেন। আশালতার বাবার বাড়ি তথা শৈশব কাটে বিহারের ভাগলপুরে। প্রাবন্ধিক আশালতা লিখছেন — ''সতীনাথকে বলা যায় বিহারের লেখনী চিত্রকর।''[৫৭]

বিহারের গ্রাম তার প্রকৃতি-মানুষজন প্রভৃতি সতীনাথের লেখনী মারফৎ পাঠক সমাজের কাছে একটি নতুন মাত্রা নিয়ে হাজির হয়েছে। ঢোঁড়াই চরিত মানস (প্রথম এবং দ্বিতীয় খন্ড) লিখে সে প্রমাণ লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী পূর্বেই দিয়েছেন। যে কয়েকজন ঔপন্যাসিক প্রথম উপন্যাস লিখেই সাহিত্য ক্ষেত্রে পাঠকের মনে জায়গা করে নিয়েছেন সতীনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রথম লেখা উপন্যাস 'জাগরী', নিজের রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা এবং মানবদরদী শিল্পীর মানবতার সমন্বয় ঘটেছে তাঁর এই প্রথম ঔপন্যাসেই।

স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য একটি পরিবারের লোকজনের উপর কীভাবে সংকট নেমে আসছে তার বিবরণ যেমন এই উপন্যাসে পাঠক পায় তেমনি জেলে মহিলা বিভাগের একটি সুনিপুণ চিত্রও 'লেখনী চিত্রকর' সতীনাথ তাঁর এই উপন্যসে তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসে যেমন গল্পেও তেমনি কথাশিল্পী সতীনাথ ভাদুড়ী অত্যন্ত সাবলীল। তার এক একটি গল্পে এক একটি রহস্যলোক সৃষ্টি করে চলেছে।

'রোগী', 'রহস্য', 'বমি', 'কপালিকা', 'এক ঘন্টার রাম', 'চরণদাস', 'এম-এল-এ' প্রত্যেকটি গল্প বিষয়বস্তু আঙ্গিক চরিত্র সমস্ত দিক দিয়েই সার্থক। মাত্র আটান্ন বছর বয়সে এই কথা সাহিত্যিকদের দেহান্তর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাই অপরিসীম ক্ষতি।

'আমাদের ভাগলপুরের শরৎচন্দ্র' —

এই প্রবন্ধটি ১৯৭৫-এর ২৭-২৯ ডিসেম্বর ভাগলপুরের 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৪৮তম অধিবেশন'এ আশালতা সিংহের ভাষণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ ১৯৭৫ সালটি বিশ্বের আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ রূপে উদ্‌যাপিত হয়েছিল। তাই ওই সালটি আশালতার কাছেও আলাদা গুরুত্ব নিয়ে ধরা দেয়। নারীর নিজস্ব কন্ঠস্বরকে প্রকাশ করতে আশালতা নারী জাতির উন্নতিতে অমর কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।

প্রবন্ধটিতে বিহারের ভাগলপুর শহরের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যে সম্পর্ক ছিল সেটাও প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন। শরৎচন্দ্রের শৈশব, কৈশোর এবং প্রথম যৌবনের অমূল্যদিনগুলি তিনি যে ভাগলপুরে অতিবাহিত করেছেন এবং ভাগলপুরেই যে এই কথাসাহিত্যিকের প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি এসব কথাও

আমরা আশালতার ভাষণ থেকে জানতে পারি। শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ চরিত্র কিংবা শিকার পার্টিতে আমন্ত্রণ করা সেই রাজার ছেলেটিও যে ভাগলপুরে দেখা বাস্তব চরিত্র সেসব কথাও আশালতা শ্রদ্ধার সঙ্গে জানিয়েছেন।

'কল্লোলযুগ' — 'কথাসাহিত্য'-এ ১৩৮৮ সালে কার্তিক-এ আশালতা সিংহের এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

এই প্রবন্ধে আশালতা নিজের জীবনের শৈশব, কৈশোর এবং প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

মোক্ষদা গার্লস স্কুলে পড়বার সময় আশালতা যে ওখানে চরকায় সুতো কাটতেন সেটা এত সরু ও শক্ত হত যে চরকা কাটায় প্রতিবার সে প্রথম হত। সেই চরকার সুতো দিয়ে ধুতি বুনে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে তা দেওয়া হয়েছিল এতে কিশোরী আশালতার যে পরম প্রাপ্তির কথা অকপটে প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন। এমনকি আশালতার লেখা নারী প্রবন্ধ প'ড়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে যে স্নেহপূর্ণ চিঠি দিয়েছিলেন — সেকথাও আমরা এই প্রবন্ধ থেকে জানতে পারি।

এরকম ব্যক্তিগত জীবনের ছোট ছোট টুকরো স্মৃতিতে ভরা এই প্রবন্ধটির গুরুতত্ব অনস্বীকার্য।

'ভাগলপুরের স্মৃতি' — আশালতা সিংহের লেখা এই প্রবন্ধটি 'প্রসঙ্গ ভাগলপুর' গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটি মুদ্রিত হয় ১৯৯৯ সালে। ১৯৬৯এর ডিসেম্বরে এটি প্রথমে 'স্মরণী' পত্রিকায় হয়েছিল। আশালতা ভাগলপুরের জীবনের কথা এখানে বর্ণিত হয়েছে। আমরা জানি আশালতা তাঁর শৈশব-কৈশোরের দিনগুলি ভাগলপুরে কাটিয়েছিলেন। এই শহরেই তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম হাতে খড়ি। শহরটি তাই তাঁর কাছে স্বপ্নের এবং অত্যন্ত ভালোবাসার। ভাগলপুর শহরকে স্মরণ করে প্রাবন্ধিকের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রকাশ পেয়েছে —

> ''কী সাহিত্যে কী সঙ্গীতে কী অভিনয়ে কী আলোচনায় ভাগলপুরের দান অসামান্য! সে দানে প্রাদেশিকতার কোন ছাপ ছিল না। মনে হত জাহ্নবীতীরে ভাগলপুর যেন দেবী সরস্বতীর নিভৃত নিকুঞ্জ নিবাস। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সাধক তাঁদের প্রতিভার কলগুঞ্জনে এই নিভৃত নিকুঞ্জটিকে মুখরিত করে তুলেছিলেন।''[৫৮]

তথ্যসূত্র ও প্রসঙ্গ নির্দেশ —

১) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'বাস্তব ও কল্পনা', 'সমী ও দীপ্তি', সন্তোষ মজুমদার ও মায়া ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'আশালতা সিংহ রচনাবলী', বিহার বাংলা আকাডেমি, মার্চ ১৯৯০, পৃ. ৫০৫

২) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'সাহিত্যে পরিপূর্ণতা', 'সমী ও দীপ্তি', সন্তোষ মজুমদার ও মায়া ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'আশালতা সিংহ রচনাবলী', বিহার বাংলা আকাডেমি, মার্চ ১৯৯০, পৃ. ৫১০

৩) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'সাহিত্যে রিয়ালিজম' 'সমী ও দীপ্তি', সন্তোষ মজুমদার ও মায়া ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'আশালতা সিংহ রচনাবলী', বিহার বাংলা আকাডেমি, মার্চ ১৯৯০, পৃ. ৫১৩

৪) দ্র. তদেব, পৃ. ৫১৭

৫) দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ 'সাহিত্যের সামগ্রী', 'সাহিত্য', বিশ্বভারতী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩১৪। (c) বিশ্বভারতী, ১৯৬৪, পৃ. ১৯

৬) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'পরিচয়', 'সমী ও দীপ্তি', সম্পাদনা শম্পা সিন্‌হা, মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আশাদীপ, ১০/২ বি. রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, পৃ.৮৫

৭) দ্র. তদেব, পৃ. ৮৬

৮) দ্র. ঐ

৯) দ্র. তদেব, পৃ. ৮৮

১০) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'সমালোচনা', 'সমী ও দীপ্তি', সম্পাদনা শম্পা সিন্‌হা, মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আশাদীপ, ১০/২ বি. রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, পৃ.৯১

১১) দ্র. তদেব, পৃ. ৯৪

১২) দ্র. তদেব, পৃ. ৯৬

১৩) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'মধ্যবর্তী', 'সমী ও দীপ্তি', সম্পাদনা শম্পা সিন্‌হা, মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আশাদীপ, ১০/২ বি. রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, পৃ.১১৪

১৪) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'পৃথিবীর পথে', 'সমী ও দীপ্তি', সম্পাদনা শম্পা সিন্‌হা, মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আশাদীপ, ১০/২ বি. রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, পৃ.৯৭

১৫) দ্র. ঐ

১৬) দ্র. তদেব, পৃ. ৯৮

১৭) দ্র. ঐ

১৮) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'সবজান্তা', 'সমী ও দীপ্তি', সম্পাদনা শম্পা সিন্‌হা, মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আশাদীপ, ১০/২ বি. রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, পৃ.১০৬

১৯) দ্র. তদেব, পৃ. ১০৮

২০) দ্র. আশালতা দেবী ঃ 'নারী', 'ভারতবর্ষ', বৈশাখ ১৩৩৫, পৃ. ৬৫৯

২১) দ্র. ঐ

২২) দ্র. ঐ

২৩) দ্র. তদেব, পৃ. ৬৬০

২৪) দ্র. ঐ

২৫) দ্র. আশালতা দেবী ঃ 'নারী', 'বিচিত্রা', আষাঢ় ১৩৩৫, পৃ. ৮৩

২৬) দ্র. তদেব, পৃ. ৮৪

২৭) দ্র. ঐ

২৮) দ্র. তদেব, পৃ. ৮৫

২৯) দ্র. আশালতা দেবী ঃ 'শরৎচন্দ্র ও গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি', 'ভারতবর্ষ', ভাদ্র, ১৩৩৫, পৃ. ৪৪৮

৩০) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'বার্ট্রান্ড রাসেল ও অতীন্দ্রিয়তাবাদ', 'দ্বাদশ প্রবন্ধ', গ্রন্থনা-বিশ্বনাথ রায়, শম্পা সিন্‌হা, মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আশাদীপ, ১০/২ বি. রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, পৃ.২২

৩১) দ্র. তদেব, পৃ. ২৪

৩২) দ্র. তদেব, পৃ. ২৭

৩৩) দ্র. আশালতা দেবী ঃ 'শরৎচন্দ্র ও গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি', 'ভারতবর্ষ', ভাদ্র, ১৩৩৫, পৃ. ৪৪৭

৩৪) দ্র. তদেব, পৃ. ৪৪৯

৩৫) দ্র. তদেব, পৃ. ৪৫২

৩৬) দ্র. তদেব, পৃ. ৪৫৩

৩৮) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'শ্রী বুদ্ধদেব বসু ও বাস্তবতা', 'দ্বাদশ প্রবন্ধ', গ্রন্থনা-বিশ্বনাথ রায়, শম্পা সিন্‌হা, মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আশাদীপ, ১০/২ বি. রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, পৃ.৩১

৩৯) দ্র. ঐ

৪০) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'গোরা আর কুমুদিনী', 'দ্বাদশ প্রবন্ধ', গ্রন্থনা-বিশ্বনাথ রায়, শম্পা সিন্‌হা, মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আশাদীপ, ১০/২ বি. রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, পৃ.৪৩

৪১) দ্র. তদেব, পৃ.৪৪

৪২) দ্র. তদেব, পৃ. ৪৬

৪৩) দ্র. তদেব, পৃ. ৪৭

৪৪) দ্র. তদেব, পৃ. ৪৪

৪৫) আশালতা সিংহ ঃ 'পথের পাঁচালী ও অপরাজিত', 'দ্বাদশ প্রবন্ধ', গ্রন্থনা-বিশ্বনাথ রায়, শম্পা সিন্‌হা, মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আশাদীপ, ১০/২ বি. রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, পৃ.৫০

৪৬) দ্র. তদেব, পৃ. ৫১

৪৭) দ্র. ঐ

৪৮) দ্র. তদেব, পৃ. ৫৪

৪৯) দ্র. তদেব, পৃ. ৬৩

৫০) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'সাহিত্যের ধারা', 'দ্বাদশ প্রবন্ধ', গ্রন্থনা-বিশ্বনাথ রায়, শম্পা সিন্‌হা, মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আশাদীপ, ১০/২ বি. রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, পৃ.৭৯

৫১) দ্র. তদেব,পৃ. ৮১

৫২) দ্র. তদেব, পৃ. ৮৫

৫৩) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব', 'দ্বাদশ প্রবন্ধ', গ্রন্থনা-বিশ্বনাথ রায়, শম্পা সিন্‌হা, মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আশাদীপ, ১০/২ বি. রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, পৃ.৬৭

৫৪) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'রবীন্দ্রনাথের আধুনিক লেখা', 'দ্বাদশ প্রবন্ধ', গ্রন্থনা-বিশ্বনাথ রায়, শম্পা সিন্‌হা, মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আশাদীপ, ১০/২ বি. রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, পৃ.৯৭

৫৫) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'শিশিরের মর্মবাণী', 'দ্বাদশ প্রবন্ধ', গ্রন্থনা-বিশ্বনাথ রায়, শম্পা সিন্‌হা, মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আশাদীপ, ১০/২ বি. রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, পৃ.১০৮

৫৬) দ্র. তদেব, পৃ. ১১০

৫৭) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'সতীনাথ ভাদুড়ী', 'দ্বাদশ প্রবন্ধ', গ্রন্থনা-বিশ্বনাথ রায়, শম্পা সিন্‌হা, মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আশাদীপ, ১০/২ বি. রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, পৃ.১১১

৫৮) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'ভাগলপুরের স্মৃতি', শতবর্ষ প্রকাশনা সমিতি, ১৯৯৯, পৃ. ৩৩